শ্রীকৃষ্ণ কলেবর

—গোলকানন্দ

শ্রীকৃষ্ণ কলেবর

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

১৭ই আশ্বিন মহাষষ্ঠি, ১৩৬৭ সাল

প্রাপ্তিস্থান :

১ মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭৬

২ ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

॥ মুদ্রণে ॥

দি সানরাইজ প্রেস : ফোন চুঁচুড়া—২৪৩৮

সতী,

তুমি আজ অমৃতলোকে যাঁর শ্রীপাদপদ্মে বিরাজ করছ সেই পরম পুরুষোত্তমের শরণে।

শ্রীজগন্নাথ চরণাশ্রিত
গোলকানন্দ

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণ কলেবর

বন্দনা

নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র সুভাদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ

—*—

জয় জয় জগন্নাথ ব্রহ্ম সনাতন।
অনন্ত অচিন্ত্য তুমি কলুষনাশন॥
ভক্তি চিতে শ্রীপাদ পদ্মে মাগিতেছি ঠাঁই।
কৃপা কর প্রভু মোরে কোন গুণ নাই॥
পঙ্গুও লঙ্ঘিতে পারে পর্বত পলকে।
তব কৃপা পেলে তাহা বিদিত ভূলোকে॥
তোমার অমৃত কথা মধু দিব্য বাণী।
মুক হয় বাক্‌শুদ্ধ সর্ব সত্য মানি॥
নাহি মোর বিদ্যাবুদ্ধি নাহি মোর জ্ঞান।
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম করি শুধু ধ্যান॥
জগন্নাথ তত্ত্বকথা করিব বর্ণন।
দোষ ত্রুটি ক্ষমা কর গুণী জ্ঞানী জন॥
সর্বশেষে ভক্তপদে জানায়ে প্রণতি।
অধম গোলক গাহে জগন্নাথ গীতি॥

—*—

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণ কলেবর

(এক)

দ্বাপর ও কলিমধ্য সন্ধ্যা যুগের অবসান। গভীর তমসাবৃত গগনে ঘন কৃষ্ণ মেঘের গুরু গর্জন। ভৈরব রবে নিনাদিত অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক অশনিপাত। মর্ মর্ স্বরে দুর্জয় ঝঞ্ঝার মহাকাল স্রোত। প্রকৃতির সেই তাণ্ডব নর্ত্তনে স্তব্ধ হয়ে গেল এই মরলোকের মর্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। সর্ব হারা ধরনীর সেই ভীত স্ত্রস্ত কম্পনে সশঙ্কিত হল ভূমধ্যস্থ নাগলোক। গভীর বেদনায় দেবতাগণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সংশয় চিত্তে অন্তরীক্ষে অপেক্ষমান। সমগ্র দেবলোক নীরব নিথর। অকস্মাৎ ঝলকিত হল এক নৈসর্গিক আলোক সম্পাত। সেই আলোকে প্রতিভাত হল প্রভাসে ভালকবনে বৃক্ষ তলে জোড় করে উপবিষ্ট-নিষাদ-জরা। নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া আছে উর্দ্ধদিকে বৃক্ষ শাখার প্রতি। নয়নে বয়ে চলেছে অবিরল অশ্রুধারা। ওষ্ঠে ফুটে উঠেছে মর্মান্তিক করুণ স্বর "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেব! আমি ভ্রান্ত, আমি অজ্ঞ, আমি অপরাধী, বনবাসী নিষাদ।

বল, বল, দেব এপাপের প্রায়োশ্চিত্ত কি?"

বৃক্ষ'পরে অর্দ্ধশায়িত নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। মুখে তাঁর অনাবিল হাসি। নয়নে অপার কৃপার ক্ষমা সুন্দর প্রশান্ত দীপ্তি কণ্ঠে মধুর অমৃত বর্ষন। জরা তোমার অপরাধ নেই তুমি নিমিত্ত মাত্র। সবই বিধি নিদৃষ্ট। তোমার হাতেই হবে আমার পার্থিব লীলাবসান।"

নিষাদ উদ্বেলিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠল "প্রভু আমার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কি? সমস্ত বনভূমি অনুরনিত হল ভগবানের কণ্ঠানিসৃত মৃদু গম্ভীর ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতিটি

মুচ্ছনায় "জরা আমার এই দেহ তুমি নিয়ে যাও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। একে সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য রেখে কিছুকালের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কর অতি নির্জনে।" জরার কাতর চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তবে, একি তার প্রতি কোন ভবিষ্যতের শুভ নির্দেশ? তার অন্তরে দোলা দেয় শত শত প্রশ্নের ঝড়। অন্তর্যামী নারায়ণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'কলিতে আমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে "জগন্নাথ" রূপে বিরাজিত থাকবো। তুমি আমার দেহ উড়িষ্যার মহানদীতীরে কন্টিল্য গ্রামে গভীর অরণ্যে রক্ষা কর। কালে, শেষ পাণ্ডুকুলতিলক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে আমার দেহাস্থিসহ দারুমূর্ত্তি স্থাপন করবেন। তোমার বংশ সেখানে "শবর বংশ" নামে পরিচিত হবে। আর আমার কলেবর কর্মের মূল অধিকারী হবে। তোমার পুত্র বিশ্ববসুকে এসব কথা জানিয়ে রাখবে আর তা'কে সমাজে প্রকাশ করতে নিষেধ করবে।"

জরা ভগবানের এই অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী শুনে অতিশয় বিস্মিত হল। সমস্ত শরীর তার পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এইভাবে দিন যায়। মাস যায়। বর্ষা যায়। কালের কপোলতলে গড়িয়ে পড়ে বহু বর্ষের অবিরল ধারাস্রোত।

(দুই)

মালব রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী। গভীর তিমির রাত্রি। সমস্ত নগরী সুষুপ্তির অতল তলে নিমজ্জিত। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোর স্বপ্নাচ্ছন্ন।

স্বপনের মাঝে কহে মুকুন্দ মুরারি।
শোন ভক্তপ্রিয়তম মালব কেশরী॥
আমার মন্দির হবে মহোদধী তীরে।
একথা রাখিও তুমি অন্তর গভীরে॥
শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহাগুণী মালব ঈশ্বর।
মন্দির নির্মাণ করি হও হে অমর॥
শুনি রাজা কহে দেব কেবা তুমি হও।
পরিচয় তব প্রভু আমারে শোনাও॥
দেব কহে তুমি যার নিত্য কর ধ্যান।
আমি সেই লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু ভগবান॥
মহানদী কূলে আছে শন্টিল্য সে গ্রাম।
জরা শবরের পুত্র বিশ্ববসু নাম॥
শ্রীনীলমাধব নামে মোর পূজা করে।
শবর পল্লীতে থাকি শবর উদ্ধারে॥
কহিনু তোমারে আমি অতিগুপ্ত কথা।
মন্দির নির্মাণ কর না করি অন্যথা॥
রাজা কহে হও যদি জগন্নাথ তুমি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কোথা অন্তর্য্যামী॥
চতুর্ভুজ রূপ তব দেখে ধন্য মাণি।
দেখাও আমারে প্রভু দেব চক্রপাণি॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে সুদর্শন ধারী।
চতুর্ভুজ রূপ হন দেব দৈত্যহারী॥
নৃপতি মোহিত হল এরূপ দেখিয়া।
ভকতি বিহ্বল চিত্তে রহিল চাহিয়া॥

রূপে মুগ্ধ হয়ে নৃপ পুলকিত হৃদে ।
প্রণাম করিতে গেল প্রভুর শ্রীপদে ॥
অকস্মাৎ নারায়ণ হল অন্তর্ধ্যান ।
বিষাদেতে নিদ্রাভাঙ্গি উঠিল রাজন ॥

গভীর দুঃখে রাজা কপোলে করাঘাত করেন । মনে ভাবেন তার মত মহাপাপী এ ধরায় আর কেহ নাই । অবিলম্বে রাজা মহারাণী গুণ্ডিচা দেবীকে স্বপ্ন কথা সবিস্তারে জানান । সকল কথা শুনে মহারাণীর অন্তর আনন্দে নৃত্য করে উঠল ॥ তিনি রাজাকে অতি সত্বর মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা করতে বললেন পরদিন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজদরবারে মন্ত্রি ও সভাসদদের স্বপ্ন কথা জানালেন এবং মন্দির নির্মাণের পরামর্শ চাইলেন মন্ত্রিদের সত পরামর্শে রাজা স্থির করলেন যে তিনি কৃষ্ণদেহ অন্বেষণে দেশভ্রমণে যাবেন অতঃপর বহু পাত্র মিত্র নিয়ে রাজা অতি দুর্গম পথে পাড়ি দিলেন ।

বহুদেশ, নদ নদী: গিরিসঙ্কট, বন উপবন অতিক্রম করে রাজা অতিকষ্টে উড়িষ্যার মহানদী তটে শবর পল্লীতে উপনীত হলেন । পল্লীর পশ্চাতে অতি ভয়ংকর শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বন তার নয়ন গোচর হল তিনি কাল বিলম্ব না করে সেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেন । মনে একমাত্র চিন্তা কোথা কৃষ্ণদেহ অন্তরে একমাত্র বাসনা কৃষ্ণদেহ দর্শনের ব্যাকুলতা । তিনি বনমাঝে উদ্ভ্রান্তের মতো ‘কোথা কৃষ্ণ, ‘কোথা কৃষ্ণ’ বলে চিৎকার করতে করতে বনহতে বনান্তরে অন্বেষণ করতে লাগলেন কিছুক্ষণের মধ্যে কিরাতবেশে এক ব্যক্তিকে তার দিকে আসতে দেখলেন । রাজার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল নিকটে আসতে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন “কে তুমি ? এই বনে তুমি কি কর ? শবর পল্লীবাসী বিশ্ববসুকে তুমি চেন” ? সাধু

প্রফুল্ল অন্তরে হাসিয়া উত্তর দিল, "আমারই নাম বিশ্ববসু। জাতিতে শবর। তুমি কে? কি হেতু এই বনে প্রবেশ করেছ?" রাজা বললেন, "আমি অতি দীন মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। হে মহান তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি ভক্তিপুষ্প দিয়ে নিত্য কৃষ্ণদেহ পূজা কর। সেই পুণ্যদেহ দর্শনের আকাঙ্খায় এত দূর আমি এসেছি। বিশ্ববসুর মনে সন্দেহ জাগে। কিভাবে এই রাজা জানতে পারলেন যে এই বনে কৃষ্ণদেহ রক্ষিত আছে। সে অতিশয় বিস্মিত হল। রাজা আবার বললেন আমি তোমার সাথে মিতালী করতে এসেছি। তোমার মত একজন পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

এইভাবে অনেক কথাবার্ত্তার পর উভয়ে ফুল, তুলসী চন্দন হাতে নিয়ে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তার স্বপ্নের কথা অকপটে মিতাকে জানালেন ও কৃষ্ণদেহ দর্শনের প্রার্থী হলেন। বিশ্ববসু চিন্তা করতে লাগলো, যে গুপ্তকথা জনসমাজে আজ পর্যন্ত অপ্রকাশ্য রয়েছে তা সে কেমন করে প্রকাশ করবে। না, না সে কৃষ্ণদেহ রাজাকে দেখাবে না। এতে যদি মিত্রতা ভঙ্গের পাপ হয় তাহাও সে সহ্য করবে। তার মনে একান্ত বিশ্বাস নারায়ণ তাকে রক্ষা করবেন। এইভাবে ফুলের সাজি ও প্রসাদ হাতে নিয়ে বিশ্ববসু চঞ্চল চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল। রাজা কিছুক্ষণ পর তার হাতের স্বর্ণ থালিতে রক্ষিত প্রসাদ ভিক্ষা করলেন।

এ প্রসাদে কোন কিছু নাহি ভেদাভেদ।
আত্ম, পর, শত্রু, মিত্র নাহিক প্রভেদ॥
জলজ সরসী পর ভানুকর দ্যুতি।
কুমুদ কাননে যেন পূর্ণ চন্দ্র ভাতি॥
তোমার আমার মাঝে সেই যে সম্প্রীতি।

বাঁধিয়া রেখেছ সদা সব রীতি নীতি ॥
কপট না কর সাধু কহি হাত ধরে ।
সন্দেহ না রাখি কহ সব কথা মোরে ॥
সীতাহারা রামে হয় সুগ্রীব সহায় ।
সেইমত সহায়তা কর হে আমায় ॥
কোথায় রেখেছ তুমি সেই কৃষ্ণদেহ ।
দেখাইয়া মোরে দূর কর হে সন্দেহ ॥
রাখ হে তাপস তুমি কৃষ্ণ উপদেশ ।
ত্রিজগতে যশ তব রহিবে বিশেষ ॥

অতঃপর উভয়ে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করলেন । রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্ববসুর বহু প্রশংসা করলেন । বললেন তার স্বপ্নের সমস্ত কাহিনী । প্রকাশ করলেন তার অন্তরের ইচ্ছা । তিনি পুরুষোত্তমে মহোদধী কূলে মন্দির নির্মাণ করে দেহাস্থি যুক্ত দারু মূর্ত্তি সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তার প্রতি ভগবানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। বিশ্ববসু রাজার মুখে তার স্বপ্ন দর্শিত কাহিনী শুনে অতিশয় আনন্দিত হলেন । কিন্তু তার মনের গভীরে নানা চিন্তা দেখা দিল। তবে কি তার পিতৃবাক্য সফল হবার সময় উপস্থিত ? নারায়ণের দৈববাণী রূপায়িত হবার শুভক্ষণ কি আগত ?

লইবে প্রভুরে রাজা নীলগিরি পরে ।
প্রতিষ্ঠিত হবে হরি জীবমুক্তি তরে ॥
তুলসী দিয়েছি আমি প্রভুর চরণে ।
কেমনে ছাড়িব আজি তাই ভাবি মনে ॥
জগন্নাথ নামে হরি বিরাজিবে সেথা ।
দর্শন করিবে সবে না হবে অন্যথা ॥
উপায় না দেখি বসু কহিল রাজনে ।
দেখাব তোমারে আমি দেব নারায়ণে ॥

সাধু বিশ্ববসু। পুণ্যাত্মা বিশ্ববসু, কৃষ্ণভক্ত বিশ্ববসু মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জানায়। হে নারায়ণ, হে ভক্তবৎসল পতিত পাবন। হে দুষ্ট দমন, কলুষনাশন, কলিতে তুমি জীব মুক্তি কল্পে নীলাচলে অধিষ্ঠিত থাকবে। এর অধিক আর কি হতে পারে? কলিতে এই প্রপঞ্চক্লিষ্ট মানুষ তোমার নাম গানে মুখর হয়ে উঠবে। তাদের ত্রিতাপজ্বালা দূর হবে। প্রাণে শান্তি ফিরে পাবে। তোমার অসীম করুণার সুস্নিগ্ধ বারি ধারায় পরম পবিত্র হবে, তৃপ্ত হবে পাপীর পাপাচারে কলুষিতা, অত্যাচারিতা, লাঞ্ছিতা এই ধরণী। তাই হোক প্রভু। সার্থক হোক তোমার শ্রীমুখ নিসৃত গীতার ব্রহ্মবাণী।

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।...
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে

(তিন)

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিশ্ববসু সেই গভীর কাননে প্রবেশ করলেন শ্বাপদ সঙ্কুল এই বনে বাঘসিংহের গর্জন শোনা যেতে লাগলো। মুহুর্ত্তমধ্যে যে কোনও বিপদ ঘটতে পারে। মহারাজ নিঃসংশয়ে এগিয়ে চলেছেন। বহুদূর যাবার পর নীলাচল বালু পর্বতের সানুদেশে পৌছুলেন এবার ভূমি উচ্চ হতে ক্রমশঃ উচ্চতর হতে লাগল। মৃদু মধু সুরভিত সমীরন বয়ে চলেছে। মনের সন্তাপ ও শারিরীক ক্লেশ ক্রমশঃ স্বাভাবিক হয়ে আসছে নিম্নে মহানদী কল্ কল্ রবে ছুটে চলেছে মহা উল্লাসে সাগর সঙ্গমে যেন মনে মনে বলছে, হে করুণাময় স্থান দাও ও রাঙ্গা চরণ কমলে। রাজা ও বিশ্ববসু পর্ব্বত শিখরে পৌছলেন।

এই সেই শ্যামলা কটিলা পর্বত। যেখানে নিজ বিভূতিযুক্ত এক অশ্বথ মূলে শ্রীহরি মহাশয়ানে শায়িত। তাঁর বিরাট দেহ নীলবর্ণ ও স্বর্গীয় সুষমায় প্রদীপ্ত। অচিন্ত্য, অব্যক্ত শঙ্খ চক্র, গদা পদ্মধারী দৈত্যহারী। এই অপরূপ রূপ দেখে নৃপতি বিস্মিত ইনিই হবেন কলিতে জগন্নাথ নামে নীলাচলে নীলচক্রতলে বিরাজমান। আহাঃ কি অপূর্ব এই মোহন রূপ!

হে প্রভু দয়িত তুমি করুণা অপার।
কি আর কহিব আমি বিশ্বের আধার॥
অসুরে বিনাশ করি ভক্ত পরায়ন।
রক্ষিলে দেবতা কুলে দেব নারায়ণ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি পুরাও মনস্কাম।
জগন্নাথ রূপে এস পুরুষোত্তম ধাম॥

অতি ভক্তি ভরে মহারাজ অন্তরের বাসনা জানালেন। মনে তার একটি মাত্র কামনা। "এস প্রভু মঙ্গলময় করুণা নিদান, কলির কলঙ্ক মুছে দাও তোমার রাতুল চরণ পরশে।

রাজা আকুল ভাবে শ্রীহরির চরণ বন্দনা করে বিশ্ববসু সঙ্গে পর্বতের পাদদেশে চল্‌লেন মহোদধী তীরে। কোনও স্থানই তার চিত্ত আর্কষণ করল না। অবশেষে বহুদূরে দেখতে পেলেন এক মনোহর পর্ব্বত। নাম নীলগিরি॥

সবুজ বনানী ঘেরা অতি মনোহর।
নানাবিধ লতাগুল্মে শোভিছে সুন্দর॥
শ্রীফল, চন্দন বৃক্ষ শাল নিম্বতরু।
রসাল কদম্ব আর জাম দেবদারু॥
অশোক অশ্বত্থ বট চম্পক চামেলি।
কেতকি যুথিকা জবা মুচকুন্দ বেলী॥
মাধবী মল্লিকা চম্পা অতসী বকুল।
কতরঙে শোভিতেছে কতশত ফুল॥
দূর হতে দৃশ্য হয় নীলের মাধুরী।
সে কারণে নাম তার হয় নীলগিরি॥

মুগ্ধ হয়ে রাজা বিশ্ববসুকে বললেন, 'চল দেখি, এই শিখর দেশে আর কি আছে।" দুই সখা মিলে চারদিক দেখতে হঠাং নজরে পডল এক অদ্ভূত বৃক্ষ। কোনও ফুল নেই, ফল নেই, এমন কি একটি পত্রও নেই। মহারাজ বিশ্ববসুকে জিজ্ঞাসা করলেন; "এই বৃক্ষের নাম কি?"

শুনিয়া হাসিয়া কহে সাধু বিশ্ববসু।
কল্পবট এর নাম সর্ব্ব ফলপ্রসু॥
সত্যযুগ হতে রয়েছে হেতায়।
পশু পক্ষী সুশীতল ইহার ছায়ায়॥
পুত্রহীনা নারী যদি অঞ্চল পাতিয়া।
বসে এর তলে পুত্র কামনা করিয়া॥
যদি ফল পড়ে এক অঞ্চলের পরে।
ভাগ্যক্রমে সেই নারী পুত্র লাভ করে॥

ঐ বট গাছের উপর নিশ্চল নিস্পন্দ একটি পক্ষী বসে আছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ পক্ষীটি ঐ ভাবে নীরবে বসে আছে কেন ? কি নাম ওর ? বিশ্ববসু জানালেন, "ওর নাম আমি জানিনা তবে পিতার সঙ্গে আমি একবার এখানে এসেছিলাম। তখনও আমি দেখেছিলাম ঐ পক্ষী ঐ ভাবে ঐখানে নীরবে বসে আছে। কোথায় ওর বাসা বা কবে থেকে ও ঐভাবে গাছের উপর বসে আছে তা আমি জানিনা" কথা বলতে বলতে দুই মিত্র দক্ষিণ দিকে এসে দেখলেন সামনেই একটি কুণ্ড। তার জল নির্মল ও স্বচ্ছ, বিশ্ববসু রাজাকে বললেন যে ঐ কুণ্ডের নাম রোহিনী কুণ্ড। অতি পবিত্র। স্পর্শ মাত্র সব পাপনাশ হয়ে যায়।

গোবধ ব্রাহ্মণ বধ কন্যার হরণ।
সুরা পান আদি যত পাপের কারণ॥
মিথ্যাচারি পাপাচারী যত নীচাশয়।
স্পর্শমাত্র এই বারি দূর হয়ে যায়॥

বিশ্ববসু আরও বললেন যে ঐ কুণ্ডের নীচে একটি নির্ঝরিণী ধারা বয়ে চলেছে, মার্কণ্ড সরোবরে॥ তারপর দুই সখা পশ্চিম দিকে একস্থানে এসে দেখলেন যে একখণ্ড পাথরের উপর অঙ্কিত দুইটি চরণ। ইন্দ্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলেন যে 'এই চরণ কার'। বিশ্ববসু বললেন, "দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ বিসর্জনের পরে মহেশ্বর মহাক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সতীদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচনে মেতে উঠেন।

সতীহারা মহাদেব রূপ ভয়ংকর।
প্রলয় অনলে জ্বলে সংসার সাগর॥
দ্বাদশ রবির তেজবহ্নি ত্রিনয়নে।
সংহার মূর্ত্তি দেব রক্তিম বয়ানে॥
বিশ্বসৃষ্টি লয় কল্পে বৈশ্বানর।

দেখি বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেতে ভাবিত অন্তর ॥
সৃষ্টি রক্ষা হেতু দেব ধরি সুদর্শন ।
খণ্ড খণ্ড করি দেহ ফেলিল তখন ॥

এইভাবে সতীঅঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানাদেশে। বাহান্নটি খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা দেশে। সৃষ্টি করল বাহান্নটি পীঠের। এখানে দেবীর চরণ দুটি পড়েছিল। এই জন্য এর নাম পাদপীঠ। এখানে দেবী বিমলা নামে ভৈরবীরূপে অবস্থান করছেন। "লোকনাথ শিব যত্র, যত্র তীর্থ মহোদধী, বিমলা ভৈরবী যত্র, তত্র জগন্নাথ ভৈরব।" ভগবতী চরণে প্রণাম জানিয়ে দুই মিত্র ফিরলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন কল্পবৃক্ষের সেই পক্ষী রোহিনী কুণ্ডে মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। তার চতুর্ভুজ রূপে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়েছে। রাজা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন সখাকে এই পক্ষীর বিবরণ বলতে বললেন কিন্তু বিশ্ববসু বললো সে এই পক্ষীর বিবরণ কিছুই জানে না। তবে নিকটে ভৃগু, পাণ্ডু, অঙ্গিরা, দুর্বাসা প্রভৃতি বহু মহাঋষির আশ্রম আছে। তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা এই বিচিত্র পক্ষীর বিবরণ ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন।

নিকটেই ছিল অঙ্গিরা মুনির আশ্রম। দুইজনে সেই আশ্রমে গেলেন। মহামুনি তখন ধ্যানমগ্ন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনিকে প্রণাম করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ধ্যান ভঙ্গের পর মহর্ষি মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বললেন. "তুমি কল্পবৃক্ষের সেই পক্ষীর বিচিত্র কাহিনী জানতে চাও। আমি বুঝেছি" সর্ব্বজ্ঞ মহামুনির কিছুই অজ্ঞাত নহে। তিনি সেই পক্ষীর বিচিত্র কাহিনী ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন," একদিন দেবসভায় নৃত্যরতা উর্বশী মহাঋষি অষ্টবক্রকে আসতে দেখে তার কুব্জদেহের প্রতি কটাক্ষ করে মুখে আঁচল দিয়ে হেসে ফেলেছিল।

তাই দেখে মহাঋষি ক্রোধে অধীর হয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন। "পাপীয়সী, জারজা, কলঙ্কিনী, নর্ত্তকী আমার অভিশাপে তুমি মর্ত্তে গিয়ে কাক পক্ষী হয়ে বাস করো। তুমি সেখানে "ভুষণ্ড" নামে পরিচিত হবে। মুনির অভিশাপে দেবতাগণ চঞ্চল হলেন। উর্বশী লজ্জায় মর্মাহত হয়ে মহর্ষির পায়ে লুটিয়ে পড়লো। "ক্ষমা কর! ক্ষমা কর; হে মহর্ষি প্রবর ক্ষমা কর বলে দাও আমার এ পাপ মুক্তির উপায়। উর্বশির ক্রন্দনে মুনির হৃদয় বিগলিত হল। তিনি বললেন,

নর্ত্তকী উর্বশি শোন মনপ্রাণ দিয়া।
পরবে পোড়াবে যবে অনুতপ্ত হিয়া॥
বিশ্ববসু সঙ্গ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন গুণী।
একত্রে দেখিবে তোমা বৃক্ষ পরে ধনি॥
মুক্ত হয়ে যাবে তুমি অভিশাপ হতে।
চতুর্ভুজ রূপে ফিরে আসিবে স্বর্গেতে॥
আজি পক্ষী তোমাদের দেখি একত্রেতে।
রোহিণী কুণ্ডেতে এল পিপাসা মিটাতে॥
যেই দণ্ডে সেই পক্ষী কুণ্ডে জল খায়।
চতুর্ভুজ রূপে তথা মুক্ত হয়ে যায়॥

বিশ্ববসু রাজাকে বললেন, "দেখুন মহারাজ এই চতুষ্কোণ উচ্চভূমি—এর নাম "দেবস্থান" এখানে প্রতিরাত্রে দেবতারা এসে দেখা করেন। শ্রীভগবানের স্তুতি করেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলগিরি শিখর পরিদর্শন করে মনে মনে স্থির করেন এই স্থানেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করবেন। কেননা এর চেয়ে পবিত্র স্থান এই নীলাচলে নেই। এর পূর্বে কল্পবট, পশ্চিমে সতীপাদ পীঠ দক্ষিণে রোহিণী কুণ্ড ও উত্তরে দেবস্থান। সুতরাং এই স্থানই মন্দিরের উপযুক্ত পুণ্যক্ষেত্র। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্ববসুর নিকট হতে অতি সত্বর বিদায় নিয়ে অতি বিনয়ের সঙ্গে তাকে মালব যাবার আমন্ত্রণ

দেন

জানিয়ে তিনি মালবে ফিরে গেলেন। মনে তার একমাত্র বাসনা মন্দির নির্মাণ কিন্তু কি করে তা সফল হবে? তার চিন্তায় তিনি উৎকণ্ঠিত। হে নারায়ণ তুমি বলে দাও। কি করব কেমন করে মন্দির গড়বো। কি করে তোমায় আদেশ কার্য্যে রূপান্তরিত করবো। হে প্রভু তুমি সহায় হও। তুমি ছাড়া অন্য ভরসা নেই। হে কৃপাময় তোমার অপার কৃপাই আমার একমাত্র সম্বল!

"হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।
গোপী চ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে॥"

(চার)

দেশে ফিরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, সভাসদদের ডেকে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত জানালেন। আরও বললেন যে তিনি উড়িষ্যায় মহোদধীকূলে নীলাচলে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করবেন। কারণ ঐই স্থান মন্দিরের উপযুক্ত স্থান। সেখানে দেবীর চরণ পড়েছিল। এবং সেইজন্য এর নাম পাদপীঠ। আর আছে কল্পবট এবং রোহিণী কুণ্ড পরম পবিত্র স্থান। সকলে রাজার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ও মন্দির নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করতে বললেন। যাহাতে মহারাজের এই শুভ ইচ্ছা ফলবতী হয় তার জন্য তারা সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। সমগ্র মালব রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মহারাজ, মহারাণী গুন্ডিচাদেবী সহ বহু অর্থ মণিমাণিক্য, বহুসৈন্য সামন্ত, দাসদাসী সঙ্গে নিয়ে উড়িষ্যা যাত্রার আয়োজনে ব্রতী হলেন একদিন প্রাতঃকালে শুভক্ষণে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তার শুভকর্ম সাধনের জন্য উড়িষ্যার নীলাচল উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

মুহু মুহু ভেরী বাজে হয় শঙ্খধ্বনি
জয় জয় ইন্দ্রদ্যুম্ন জয় পুণ্য নৃপমণি।
ধন্য তুমি মহাগুণী প্রজানুরঞ্জন.
যশ লভি হও জয়ী প্রজানুরঞ্জন।

বহু পথ অতিক্রম করে রাজা একদিন নীলাচল সন্নিকটে কপোতেশ্বরে এসে বিশ্রামের জন্য একরাত্রি সেখানে অবস্থানের পর প্রাতে পুরুষোত্তমে উপস্থিত হলেন। লোক-লস্কর লাগিয়ে নীলগিরির বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন ও তাকে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণের জন্য আদেশ করলেন। মন্দির নির্মাণের জন্য বহু দেশ থেকে বহু পাথর নিয়ে আসা হল। কেননা নীলাচলে শুধু বালি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। রাজা এর জন্য বহু কর্মী নিয়োগ করলেন। বড় বড় নৌকা

তৈরী করা হল। তারপর সৈন্যসামন্তদের তত্ত্বাবধানে ঐ নৌকা করে পাথর আনা হতে লাগল। মন্দিরের পাথর সাত রকমের। কুণ্ডু শীলা হল সবচেয়ে উচু স্তরের। কুণ্ডু শীলা এল আড়াগড় থেকে। নীলগিরি থেকে এল আর অর্কমা। বিশ্বনাথ থেকে এল ছিট শীলা। জগদল গিরি থেকে এল শাহান, আর খুরদা থেকে এল মাস্করী। ভুবনেশ্বরী এল বানপুর থেকে। এইভাবে মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলল।

এমন সময় দেবর্ষি নারদ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। হরি গুণগানে ও সুললিত দেবগানে মুখরিত হয়ে উঠল সমস্ত নীলাচল। মহারাজ পরমানন্দে দেবর্ষির চরণ বন্দনা করলেন। নানা উপাচারে তার চরণে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করলেন রাজা বললেন আজ আমি মহাভাগ্যবান, আপনাকে দর্শন করে ধন্য হলাম। কৃপা করে বলুন আপনার এখানে আসার কারণ। এ অধমকে আপনার কোন কাজে লাগতে পারে? রাজার এই অমায়িক ব্যবহারে ঋষি আনন্দিত হয়ে বললেন,—

বিষ্ণুপদে ভক্তি তব দেখিয়া রাজন।
উপদেশ দিতে মোর হেথা আগমন॥
মন্দির নির্মাণ পূর্বে করি বিষ্ণুপূজা।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ কর তুমি রাজা॥
ঘোষিত হইবে বিশ্বে তব যশগান।
জগতে মহান কীর্ত্তি রহিবে অম্লান॥
নীল সে সুন্দর গিরি হইবে বিখ্যাত।
ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে রবে অতীব প্রখ্যাত॥

দেবর্ষির কথায় রাজা অত্যন্ত প্রীত হয়ে মহোদধীতীরে অপোড়া-অপরা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় মহাপুণ্যভূমি ও শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান সেই

নীল পর্ব্বতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অক্ষয় তৃতীয়ার মহাপূণ্য দিনে শুভলগ্নে অতি শুদ্ধাচারে মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন! হে নারায়ণ! করুণার অবতার! ভক্ত প্রাণধন তুমি এস, তুমি এস!

হরষ অন্তরে নৃপ মানসিক করে।
করুণা সাগর তুমি দয়া কর মোরে॥
মনের বাসনা মোর পূর্ণ কর তুমি।
তোমার মন্দির করি তব পদে নমি॥
এস হে ব্রহ্মাণ্ডদেব পতিত পাবন।
তোমার মন্দিরে তুমি এস ভগবান॥

এই পরম লগ্নে দুটি কপোত কপোতী উড়ে এসে রাজার অতি সন্নিকটে চরে বেড়াতে লাগল। রাজা এই কপোত কপোতীকে দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন। তাঁর মনে হল হর-পার্ব্বতী কপোত কপোতী রূপে এখানে উপস্থিত। তিনি অতি স্নেহভরে পাখীদুটিকে সযত্নে নানা মিষ্টান্ন ও ফল খাওয়াতে লাগলেন দেবতাজ্ঞানে ওদের পূজা করলেন। শিরে ফুল, চন্দন, বিল্বপত্র ইত্যাদি দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। ভক্তিভাবে পূজা শেষ করে প্রার্থনা করলেন।

হে শিবশঙ্কর, তুমি শম্ভু শূলপানি।
হর হর মহাদেব দেব চূড়ামনি॥
তুমি হে কৈলাসপতি তুমি মহেশ্বর।
পার্বতি রঞ্জন দেব উমার ঈশ্বর॥
তোমার শরণ লই মন্দির নির্মাণে।
শক্তি দাও চিত্তে প্রভু এই মূঢ় জনে॥

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শিব পূজা করে বর লাভ করলেন। এই স্থান কপোতেশ্বর নামে পরিচিত হল। এখানে চন্দ্রভাগা নদীতে

সন্তের

মাঘ মাসে শুক্ল সপ্তমী ও শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে স্নান করে শিব দর্শন করলে মহাপুণ্য লাভ হয় সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আজও ঐ তীর্থ স্থানটি বহু তীর্থযাত্রী ও পুন্যার্থীদের কলরোলে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ সমাপন করে বহু রত্ন মণিমাণিক্যাদি ও বহু গাভী দান করলেন। গাভীদের পদভারে একটি বৃহৎ সরোবরের সৃষ্টি হল। ঐ সরোবর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে খ্যাত।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞাগারটি রাণী শ্রীগুণ্ডিচা দেবীর নামে গুণ্ডিচা মন্দির নামে আজও শ্রীক্ষেত্রে বিরাজ করছে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ শ্রীমন্দির থেকে যাত্রা করে ঐ গুণ্ডিচা মন্দির পর্যন্ত যায়। ওই মন্দিরে আটদিন শ্রীজগন্নাথ অবস্থান করে আবার শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন। এই যাত্রার নাম পতিত পাবন যাত্রা। যা আজ রথযাত্রা নামে পরিচিত।

"রথেচ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"॥

(চার)

কলি আগত ঐ। ধর্ম্মস্থানুর মত নিশ্চল। দেবতারা চিন্তিত। কি হবে? তবে কি বিশ্বের মানবকুল কলির প্রভাবে অত্যাচারিত লাঞ্ছিত হয়ে অধর্মের যুপকাষ্ঠে বলি হবে? মুছে যাবে পার্থিব শুচি শুভ্রতা? মানবের মহান অন্তর কি রঞ্জিত হবে কলঙ্কের কালিমায়? না-না তা হতে পারে না। জাগো! জাগো নারায়ণ তোমার করুণার পুত শান্তি বারিধারায় বিধৌত কর কলির কলঙ্ক। রক্ষা কর অকল্যাণের করাল গ্রাস হতে এই ক্লিষ্টা ধরণীকে। ভীত ত্রস্ত মানবের আর্ত্ত আহ্বানে ধ্বনিত হল—

ব্রজের বিহারী হরি সুদর্শনধারী।
বিরাজিবে মৌন রূপে মুকুন্দ মুরারী॥
দর্শন করিয়া তারে পাপমুক্ত হবে।
ত্রিতাপে তাপিত নর ব্রহ্মপদ পাবে॥

মাভৈঃ-মাভৈ! নীলাচল জেগে উঠল। মহাকলরোলে আকাশ বাতাস আলোড়িত হয়ে উঠল। সাড়া পড়ে গেল সমগ্র মহাক্ষেত্রে।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। গড়ে উঠছে তৃষিত মানবের মুক্তি সৌধ। কাজ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অকস্মাৎ এক বিপর্যয় উপস্থিত হয়। গভীর রাত্রে সমুদ্র উন্মত্ত হয়ে উঠল। গভীর তর্জন, গর্জন করে ও তুফান স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল শ্রীমন্দির। নিশ্চিহ্ন করে দিল মন্দিরের ভিত্তি। ভোরবেলা কারিগররা এসে সেই ধ্বংসস্তূপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক। তারা কিংকর্ত্তব্যমূঢ় হয়ে রাজার নিকট ছুটল। রাজাকে তারা সমস্ত ইতিবৃত্ত জানাল। রাজা তাদের আরও গভীর করে ভিত্তি স্থাপন করতে বললেন। রাজার আদেশ মত খুব গভীর করে ভিত্তি দেওয়া হল। মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলতে লাগল। কিছুদিন বাদে আবার সাগর স্রোতে মন্দির

ধ্বংস হয়ে গেল। রাজা বিশেষ চিন্তিত হলেন। কি হবে? কি করে দেবমন্দির নির্মাণ হবে? শেষে তিনি বরুণ দেবতার স্তবস্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। হে দেবতা, কৃপা কর; মন্দির নির্মাণে তুমি সহায় হও। জীব কল্যাণে তোমার মহিমা যুগে যুগে ঘোষিত হবে। সিন্ধু চরণে অতি বিনয়ের সঙ্গে মিনতি করলেন।

তোমারে জানাই শোন সিন্ধু মহামতি।
আকুলিত চিত্তে করি তোমারে প্রণতি॥
শ্রীমন্দির হবে হেথা স্থান দাও তুমি।
রুধি কালস্রোত রক্ষ নীলাচল ভূমি॥
তুমি এ মহান কর্ম্ম করিলে মহিতে।
সুযশ সুখ্যাতি তব রবে জীব হিতে॥

রাজার স্তুতিতে সিন্ধু তুষ্ট হয়ে তার উত্তাল তরঙ্গ সম্বরণ করলেন। সহস্র সহস্র হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীমন্দির নির্মাণের কাজ আবার আরম্ভ হল। মহা আড়ম্বরে ও উৎসাহের সঙ্গে মন্দিরের কাজ চলতে লাগল। এইভাবে বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টার পর একদিন মন্দির সম্পূর্ণ হল।

আহা! কি সুন্দর এই মন্দির! কি তার ভঙ্গিমা, কি তার সুঠাম গঠন! দৃষ্টিমাত্রই মানবের চিত্তাকর্ষণ করে। মন্দির শীর্ষে এক বিরাট চক্র, নাম নীলচক্র। তার তলে অষ্টাদশ হস্ত বিস্তারিত এক বৃহৎ শালাখণ্ড। তারপর মূল মন্দির ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে এসেছে। জগন্নাথ মন্দির চার ভাগে বিভক্ত। ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও মনিকোঠা। মন্দিরের চারটি দ্বার। পূর্বে সিংহদ্বার, পশ্চিমে শার্দুল দ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার, এবং উত্তরে হস্তীদ্বার। মন্দিরের বহিরঙ্গনে উচ্চ প্রাচীরের ঘেরা। নাম 'মেঘনাদ' মন্দিরের অন্তরঙ্গনেও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং চারটি দ্বার। অন্তরঙ্গন ও বহিরঙ্গন-র মাঝে দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মীর রন্ধনশালা। পশ্চিমে নীলাদ্রি উদ্যান। অন্তরঙ্গনের দক্ষিণ দিকে সত্যনারায়ণ মন্দির। কথিত আছে

এই কষ্টি পাথরের নারায়ণ মূর্ত্তিই নাকি সর্ব্বপ্রথম গালরাজা কর্তৃক নীলমাধব নামে এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। মঙ্গলাদেবী, বটকৃষ্ণ, অক্ষয়বট, গণেশ মন্দির ব্রহ্মবেদী বা মুক্তিমণ্ডপ। পশ্চিমে বিমলা মন্দির সত্যভামা বা সরস্বতী মন্দির উত্তরে পাতালেশ্বর এবং বিশ্বনাথ মন্দির।

মন্দির নির্মাণের পর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এক সমস্যায় পড়লেন কে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন এবং নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবেন। তিনি কি তবে এই মহাকর্মের জন্য দেবলোকে আহ্বান জানাবেন। গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, কিংবা নাগ কাকে নিযুক্ত করবেন এই মহাব্রতে? অথবা বেদপতি ব্রহ্মাকে আনবেন এই শুভ উদ্দেশ্যে? রাজা অন্তরে চিন্তা করতে লাগলেন। শেষে স্থির করলেন ব্রহ্মাকে আহ্বান জানাবেন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্তব করতে লাগলেন। এই তপস্যায় তার শতবর্ষ কেটে গেল।

ইতিমধ্যে এক বিরাট ঝড় ঝঞ্ঝায় সমুদ্রের বালি উড়ে মন্দির চাপা দিয়ে দিল। শ্রীমন্দির তলিয়ে গেল বিরাট বালুস্তূপের অতল তলে। এইভাবে আরও পঞ্চাশ বছর কেটে গেল।

উড়িষ্যার রাজা গালমাধব প্রতিদিন প্রাতে অশ্বারোহনে ভ্রমণে বের হন ও সমুদ্রে স্নান করে বাড়ী ফেরেন। একদিন ভ্রমণের সময় তার ঘোড়ার একটি পা একটি ধাতু শলাকায় আটকে যায় ও ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে পড়ে। রাজা কারণ জানবার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলেন যে ঘোড়াটির পা একটি সোনার পাতে আটকানো রয়েছে। তিনি সাবধানে ঘোড়াটির পা ঐ পাতের ভেতর থেকে মুক্ত করলেন। কৌতূহল বশতঃ রাজা কিছু বালি সরিয়ে দেখলেন একটি বিশাল স্বর্ণ চক্রের অংশ। রাজা বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। এই চক্র থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বার হচ্ছে। এই চক্রই 'সুদর্শন' নীল চক্র নামে

আজও মন্দির শীর্ষে শোভা পাচ্ছে।

গালরাজা বহুলোক লস্কর লাগিয়ে বালুস্তূপের মধ্য থেকে ঐ মন্দির উদ্ধার করলেন। এই বিশাল ও সুন্দর সুঠাম মন্দিরটি দেখে রাজা মোহিত হলেন। মনে তার বাসনা জাগলো মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করে নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপনা করে পূজা করবেন। তার ইচ্ছানুযায়ী একটি কষ্টি পাথরের মোহন মূর্ত্তি নির্মাণ করা হলো। ঐ মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পূজিত হতে লাগলো। ঐ মূর্ত্তিটি "নীল মাধব" নামে নীলাচলে বিরাজিত হলো।

এদিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তপস্যায় রত। তার কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? কি নাম তোমার? আর কি জন্যই বা এমন কঠোর তপস্যা করছ?" রাজা উত্তর দেন আমি অধম মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। আমার মনবাসনা পূর্ণ করুন। "বেদপতি বললেন, "কি চাও তুমি?" রাজা অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "হে দেব মহোদধী কূলে পরম পবিত্র স্থান নাম নীলাচল। আমি সেখানে শ্রীহরির মন্দির নির্মাণ করেছি। আপনি অনুগ্রহ করে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার পৌরহিত্য গ্রহণ করে এই শুভ কার্য্যের সমাধা করুন।"

বিরিঞ্চি বিস্মিত হয়ে বললেন, "কে তুমি ইন্দ্রদ্যুম্ন? আমি মর্ত্ত্যের মানুষদের চিনিনা। আর এই দেবলোকেও তোমাকে কেউ চেনেনা কি করে তোমার কথায় বিশ্বাস করে মর্ত্ত্যে যাবো?" রাজা অনুনয় করে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস করুন নারায়ণের আদেশে আমি এই মন্দির নির্মাণ করেছি। কলিতে নীলাচলে তিনি জগন্নাথ নামে বিরাজ করবেন। আর্ত্ত-মানবের মুক্তির জন্য। বেদপতি বললেন, "হতে পারে তুমি যা বলছ সব সত্য। তথাপি আমি মানুষের কথায় বিশ্বাস করে মর্ত্ত্যে যেতে পারবো না। তবে যদি দেবলোকে পরিচিত কোনও মহর্ষিকে সঙ্গে আনতে পারো তবে আমি মর্ত্ত্যে যেতে পারি।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি কাতর স্বরে বললেন, "বলুন প্রভু, অঙ্গিরা ব্যাস, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ্য, দুর্বাসা, মার্কণ্ড, সনক এদের কাকে নিয়ে আসবো?" ব্রহ্মা বললেন "জগতে বহু ঋষি, মহর্ষি বলে খ্যাত। কিন্তু ঐ সব মহর্ষিরা কেউই যোগ তপস্যায় স্থির থাকতে পারেন নি। সেখানে তুমি এমন প্রাজ্ঞ ঋষি কোথায় পাবে? যার কথায় বিশ্বাস করে আমি মর্ত্যে যাবো।" রাজা সজল নয়নে বললেন, 'তবে কি প্রভু আমার বাসনা পূর্ণ হবে না? শ্রীহরির আদেশ ব্যর্থ হবে।" তখন বেদপতি বলেন, "হ্যাঁ। মর্ত্যে একজন মহর্ষি সর্ব্বগুণান্বিত আছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুনি নাম তার লোমশ। যদি তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পার তবেই আমি মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার গ্রহণ করতে পারি।"

ব্রহ্মার কথায় রাজা ফিরে এলেন। বহু সাধনায় ও তপস্যায় ও কাতর মিনতি সহকারে লোমশ মুনিকে সন্তুষ্ট করে তার মন বাসনার কথা জানালেন। আরও জানালেন ভগবানের নির্দ্দেশ। মুনি রাজার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ও ব্রহ্মার নিকট রাজার পরিচয় দিতে স্বীকার করলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মুনির সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হলেন।

লোমশ বললেন, হে পদ্মযোনি! মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি মহৎ, সৎ এবং আমার অতি পরিচিত। এই পাণ্ডুকুল-তিলক মহারাজ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও একজন পরম ভক্ত। এর মনবাসনা পূর্ণ করে সমগ্র মানব জাতিকে কালের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করুন। কলিতে শ্রীভগবান তাঁর নশ্বর দেহাস্থি থেকে মূর্ত্তি নির্মাণ করবার আদেশ দিয়েছিলেন মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে, আর সেই সাত্ত্বিক রাজা নীলাচলে 'কৃষ্ণদেহ' আবিষ্কার করলেন জরাপুত্র বিশ্ববসু রক্ষিত কণ্টিলা গ্রাম থেকে। তার অন্তরের একমাত্র কামনা এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণ কলেবর শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি রূপে স্থাপন করবেন। সমস্ত শুনে লোমশ মুনিকে

বেদপতি বললেন "মুনিবর আপনার পরিচয়ে এই রাজার ইচ্ছা আমি পূরণ করবো। আমি অচিরে মর্ত্যে গমন করে ঐ শুভকার্য্যে সম্পন্ন করবো।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বেদপতি বললেন, রাজা তুমি মর্ত্যে ফিরে গিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন কর। কোনও চিন্তা নেই।"

জীবের কল্যাণে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের এই শুভ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে কলিতে নীলাচলে "কৃষ্ণ কলেবর" শ্রীজগন্নাথ রূপে "দর্শনেই মুক্তি" কল্পে দারুব্রহ্ম সনাতন সত্যে চির জাগ্রত রয়েছেন।

"দারু ব্রহ্ম সনাতন পদ্মপলাশ লোচন,
কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ॥"

(পাঁচ)

ব্রহ্মা মর্ত্যে আগমন করলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে মন্দিরের চারিদিক দেখতে লাগলেন।

অপূর্ব দেউল দেখি মহোদধী কূলে।
সুরম্য সুন্দর শোভা রত্ন বেদীমূলে॥
বিশ্বের নিয়ন্তা যার অনন্ত মহিমা।
তাহার মন্দির সে যে রূপের গরিমা॥
কৃষ্ণলীলা অপরূপ ভঙ্গি সহকারে।
নানা চিত্রে সুশোভিত মন্দির প্রাকারে॥
মন্দিরের চারিদিক ভ্রমে পদ্মযোনি।
দেখিয়া মোহিত হয় দেব দ্বিজমানি॥

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বেদপতিকে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সাদর আহ্বান জানালেন। এমন সময় গালব নৃপতি গাল এসে পৌঁছলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা কি বলছ? এ মন্দির আমি নির্মাণ করেছি।" মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিস্ময়ে হতবাক্! তিনি ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? আমি মালব রাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। আমি নারায়ণের নির্দ্দেশে এই মন্দির তৈরী করেছি।" গালরাজা বললেন, "কেন মিথ্যা বলছ? আমি এই মন্দির নির্মাণ করেছি। আমি গালব অধিপতি।"

ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি বিনয় সহকারে বললেন, "কেন মিথ্যা বল রাজন? এ মন্দির আমি নির্মাণ করেছি। একথা সত্য বলছি।"

তখন গালরাজা অতি ক্রোধে বলে উঠলেন, 'তুমি কি করে এ মন্দির নির্মাণ করলে? কেউ জানলো না! এই বিশাল মন্দির কি গুপ্ত ভাবে নির্মাণ করা যায়?"

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন শত বৎসর পূর্বে আমি এই মন্দির তৈরী করে তপস্যায় রত ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিলো বেদপতি ব্রহ্মা

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন। সেই জন্য আমি তাঁর তপস্যায় ছিলাম। আজ তিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মর্ত্যে এসেছেন।

গালবরাজা বললেন, "আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নীলমাধব নামে নারায়ণ মূর্ত্তি স্থাপন করেছি। তুমি প্রমাণ করতে পার যে এ মন্দির তোমার নির্মাণ?"

ইন্দ্রদ্যুম্ন উত্তর করলেন,—

মহাজ্ঞানি মহাগুণী পণ্ডিত প্রবর
মিথ্যাবাক্য কেন কহ গালব ঈশ্বর
কে করিল এ মন্দির হেথায় নির্মাণ।
কাহার হইল আজি কে রাখে সন্ধান॥

এইভাবে দুই নৃপতির বাদানুবাদে বিশেষ অনিষ্টের আশংকায় পদ্মযোনি বললেন, 'তোমরা দুজনে সাক্ষী নিয়ে এসে প্রমাণ কর এ মন্দির কার? অযথা বাদ প্রতিবাদে প্রয়োজন নেই।"

ব্রহ্মার কথায় গালব নৃপতি অতি আনন্দিত হয়ে যে সমস্ত কর্মিরা বালুস্তূপের মধ্যথেকে মন্দির উদ্ধার করেছিল তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এলেন।

বেদপতি তাদের বললেন, "তোমরা সত্য বল, এ মন্দির কে নির্মাণ করেছে?"

কর্মিরা রাজার ভয়ে বললে, "এ মন্দির গালব নৃপতি নির্মাণ করেছেন।"

ব্রহ্মা তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বললেন, "রাজা তোমার সাক্ষী নিয়ে এস। প্রমাণ কর যে এ মন্দির তুমি নির্মাণ করেছ"
মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের মুখে ফুঠে উঠলো—

ব্রহ্মার বচন শুনি কহেন নৃপবর,
অন্তর্যামি তুমি দেব সর্ব গুণধর॥
সর্ব তথ্য জান তুমি মিথ্যা কভু নয়।
ত্রিভুবন খ্যাত তুমি নিজ মহিমায়॥

সর্ব্বজীব পিতা তুমি করহে বিচার।
কে করে অন্যায় আর মিথ্যার আচার॥
সত্য আমি কহি দেব প্রাণ যায় যাক্।
সংকটে করিবে ত্রাণ ভুষণ্ড সে কাক্॥
চল প্রভু তার কাছে মিনতি জানাই।
রোহিনী কুণ্ডেতে পরে রয়েছে গোঁসাই॥
তার কাছে হবে সত্য মিথ্যার প্রমাণ।
সেই মোর সাক্ষী চল তার সন্নিধান॥
সে কহিবে আদি অন্ত সকল কাহিনী।
দূর হবে ভুলভ্রান্তি শুনি তার বাণী॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মুখে এই কথা শুনে ব্রহ্মা রোহিনী কুণ্ডের নিকট এলেন। দেখলেন, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভুষণ্ড পড়ে রয়েছে। ব্রহ্মার আশীষে ভুষণ্ড জীবিত হল। ব্রহ্মাকে প্রণাম করে কাক বলল, "ধন্য আমি আজ আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে আমার পক্ষী জীবন সার্থক হল। অজ্ঞ' করুণ দেব! আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে কি প্রয়োজন?" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভুষণ্ড তুমি সত্য বল এ মন্দির কার? কে নির্মাণ করেছে?" ভুষণ্ড অতি বিনয় সহকারে বলল, "প্রভু আমি এই মন্দির নির্মাণের সব বৃত্তান্ত বলবো। আমি কল্পবট বৃক্ষে বসে যা দেখেছি তা সবিস্তারে বলব।" রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এ দেউল নির্মাণ করেছেন। একদিন প্রচণ্ড ঝড়ে সমুদ্রের বালুকারাশি উড়ে গিয়ে এ মন্দির চাপা দিয়ে দেয়। বহুদিন এ মন্দির বালুকাস্তূপের তলায় পড়ে থাকে। তারপর একদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ গালবরাজ ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যান। ঘোড়ার পা যেন কিসে আটকে গিয়েছিল। পরে অনুসন্ধানে দেখতে পান ঘোড়ার পা একটা স্বর্ণ শলাকায় আটকে গেছে। অতি কষ্টে ঘোড়ার পা বার করলেন। কিন্তু বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। বালির নিচে

গোলাকার একটা স্বর্ণচক্র দেখতে পেলেন। তিনি মনে ভাবলেন নিশ্চয় বালির নিচে কোন মন্দির আছে। গালরাজা লোক লস্কর লাগিয়ে বালুস্তুপের তলা থেকে এই মন্দির উদ্ধার করলেন। প্রভু, আমি যা দেখেছি তাই আপনাকে নিবেদন করলাম।”

ভূষণ্ডের মুখে মন্দিরের ইতি বৃত্তান্ত শুনে গালবাধিপতিকে বললেন, “শোন রাজা, তুমি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এই মন্দির দাবী করেছিলে। এর জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিৎ। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ। তিনি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডি সহযোগে দারুমূর্ত্তি নির্মাণ করবেন বলে। তুমি তোমার প্রস্তর মূর্ত্তি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাও। ব্রহ্মার কথায় গালবরাজ অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। ব্রহ্মার পদে মিনতি জানিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ব্রহ্মা হাসিমুখে তাকে আশীর্বাদ করে তার একটি হাত ধরে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের হাতের উপর রেখে দুই রাজার মধ্যে মিতালী করে দিলেন। তারপর বেদপতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে আশীষ জানিয়ে অন্তর্ধ্যান করলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের হৃদয়ে আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু অন্তরে তার একমাত্র চিন্তা কিভাবে তিনি নিয়ে আসবেন সেই কৃষ্ণদেহ? কিভাবে নির্মাণ করবেন দারুমূর্ত্তি যা জগন্নাথ নামে বিরাজ করবেন এই মন্দিরে? রাজা চিন্তিত হয়ে ফিরে এলেন মালব রাজ্যে। সৃষ্টি করে এলেন সেই বিচিত্র পবিত্র মন্দির নীলাচলে। নীলচক্র শোভিত শীর্ষ, যুগান্ত বিস্ময়কারী। হৃদিমনোহারী, মানব মুক্তির জীবন্ত দীপিকা এই মন্দির পরিক্রমার ফল জন্ম জন্ম সঞ্চিত পাপনাশ করে।

“যানি কানি চ পাপানি জন্ম জন্ম শতানি চ।
তানি সর্ব্বানি নশ্যন্তি প্রদক্ষিনৌ পদে পদে ॥

(ছয়)

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। তিনি রাজ পুরোহিতের ভাই বিদ্যাপতিকে ডেকে পাঠালেন। বিদ্যাপতিকে বললেন ; ঠাকুর তুমি উড়িষ্যা যাত্রার আয়োজন কর। আমি নীলাচলে মন্দির নির্মাণ করে এসেছি। উড়িষ্যার কন্টিল্য গ্রামে শবররাজ বিশ্বাবসুর তত্ত্বাবধানে অশ্বত্থ কাননে শ্রীকৃষ্ণদেহ রক্ষিত আছে। সেই দেহ বিশ্ববসু প্রতিদিন পূজা করেন। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে। কেউ জানেনা যে ঐ পবিত্র দেহ কোথায় আছে ? তুমি বিশ্ববসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঐ দেহ নীলাচলে নিয়ে আসবে। ঐ দেহাস্থিসহযোগে দারুমূর্তি নির্মাণ করে জগন্নাথরূপে মন্দিরে স্থাপন করা হবে। আমি পরে যাত্রা করব।”

মহারাজের আদেশে বিদ্যাপতি উড়িষ্যা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। রাজা কিছু সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিলেন, একদিন শুভক্ষণে বিদ্যাপতি উড়িষ্যা যাত্রা করলেন।

বহু কষ্টে দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি উড়িষ্যায় পৌঁছলেন। পথে বহু লোককে জিজ্ঞাসা করেও কন্টিল্য গ্রাম বা রাজা বিশ্ববসুর বসতি খুজে পেলেন না। বিদ্যাপতি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হেথা সেথা অন্বেষণ করতে লাগলেন। অবশেষে বহু বন উপবন ঘুরে একদিন মহানদী তীরে কন্টিল্য গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সুন্দর বৃক্ষ লতাদি ও বিচিত্র বর্ণের কুসুম শোভিত এক মনোরম কানন মধ্যে শবররাজ বিশ্ববসুর কুটির। বিদ্যাপতির অন্তর পুলকিত হয়ে উঠলো। তিনি মনে মনে ভাবলেন এই মনোহর উদ্যানে শ্রীহরি অবস্থান করছেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

বিদ্যাপতি ধীরে ধীরে কুটির অভিমুখে এগিয়ে যান।

তিনি দেখলেন যে গৃহদ্বার মঙ্গল কলস, কদলী বৃক্ষ ও আম্রশাখা দ্বারা সুসজ্জিত। তিনি জানতে পারলেন শবররাজ বিশ্ববসুর একমাত্র কন্যা ললিতার আজ বিবাহ। সমগ্র কুটির তাই আজ আনন্দহিল্লোলে ও কলকোলাহলে মুখরিত। বিদ্যাপতি নিকটে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যায় রাজকুমারী ললিতা সখী পরিবেষ্টিতা হয়ে মালিকা হাতে নিজ পতি বরনের জন্য উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করছেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল বিদ্যাপতির উপর। রাজকন্যা বিদ্যাপতির রূপে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বিধু বিনিন্দিত মুখ। সুন্দর সুকান্তি কন্দর্পতুল্য রূপ। রাজকন্যা লাজ-মান ভুলে বিদ্যাপতির গলায় মালা দিলেন এবং তাকে পতিত্বে বরণ করলেন।

"ধন্য জীবন মোর সৌভাগ্য অপার।
বরিয়া তোমারে আজি পতিত্বে আমার"

দুজনে মিলে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। সেখানে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। পিতা মাতা সন্তুষ্ট হয়ে উভয়কে আশীর্বাদ করলেন,

সমর্পিল কন্যা তারা বিদ্যাপতির করে।
সম্পাদিল পরিণয় অতি সমাদরে ॥

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মহাআনন্দে "চির আয়ুষ্মতি হয়ে সুখে ঘর কর" বলে আশীর্বাদ করে যথাস্থানে বিদায় নিলেন।

বিদ্যাপতি বিশ্ববসুর গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। মনে তার একমাত্র চিন্তা কিভাবে কৃষ্ণদেহ দর্শন করবেন। প্রতিদিন প্রভাতে শবররাজ পুষ্প সাজি হাতে নিয়ে বাহির হন আর দিবা অবসানে গৃহে ফেরেন। বিদ্যাপতির মনে

কৌতুহল জাগে। রাজা প্রতিদিন প্রাতে কোথায় যান ?

একদিন রাত্রে বিদ্যাপতি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, ললিতা তোমার পিতা প্রতিদিন প্রাতে ফুলের সাজি হাতে নিয়ে কোথায় যান ? স্বামীর কথায় ললিতা ক্ষণকালের জন্য গম্ভীর হয়ে পড়ল। তারপর হেসে বলল, "গহন কাননে আমাদের ইষ্টদেব আছেন। প্রতিদিন পিতা তার অর্চনায় যান।" বিদ্যাপতি বললেন, "ললিতা তুমি তোমার পিতাকে বলে আমাকে তোমাদের ইষ্টদেবতা দর্শন করাতে পার ?"

দেখিতে বাসনা মোর কৃষ্ণ ভগবান
সে নীলমাধব হরি সর্ব্বশক্তিমান ॥
শ্রীচরণ সেবা তাঁর করিতে না পারি।
ব্যথিত অন্তর মোর তারে না নেহারি ॥

ললিতা দুঃখের সঙ্গে বলল, না, পিতা কাউকে কৃষ্ণদেহ দেখাবেন না। সকলের অজ্ঞাতে তিনি আছেন ঐ নিবিড় বনে অশ্বত্থমূলে। পিতা আমাকে পর্যন্ত নীলমাধব দেখাননি ॥

আমি কিছু নাহি জানি কিবা মায়া তার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ক্রীড়নক যার ॥

বিদ্যাপতি বললেন, "তুমি ভাল করে আমার কথা তোমার পিতাকে" বল। আমার কৃষ্ণদেহ দর্শনের বাসনা তিনি নিশ্চয়ই পূরণ করবেন। ললিতা বলল, "আমি জানি পিতা কাউকেই শ্রীভগবানের দেহ দেখাবেন না। 'বিদ্যাপতি ললিতাকে অনেক বুঝিয়ে বললেন, "দেখ ললিতা শ্রীভগবানের দেহাস্থি দিয়ে দারুমূর্ত্তি নির্মাণ করে জগন্নাথ নামে প্রতিষ্ঠিত করবেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। নারায়ণের এই নির্দেশ। জীবের এই কল্যাণের জন্য তুমি এই শুভকাজে সহায় হও।"

ললিতা স্বামীর কথায় ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, "আমি পিতাকে তোমার মনবাসনার কথা জানাবো, দেখি তিনি কি

বলেন।”

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববসু তার নিত্য পূজা শেষ করে গৃহে ফিরলেন। ললিতাকে ডেকে বললেন, “ললিতা এই প্রসাদ বিদ্যাপতিকে দাও।” ললিতা প্রসাদ নিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। শবররাজ বুঝলেন কন্যা বোধ হয় কিছু বলতে চায়। তিনি হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন “ললিতা কিছু বলবি। তা বলনা, অমন মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রয়েছিস কেন মা? তোকেতো আমার অদেয় কিছু নাই।”

ললিতা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলল, “পিতা তোমার জামাতা আমাদের ইষ্টদেবতার দর্শন চায়॥”

ললিতার কথা শুনে সহসা বিশ্ববসু রুষ্ট হয়ে উঠেন। তিনি বললেন, “না মা তা হয় না।” আমি আমার ইষ্টদেবতাকে সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে রেখেছি তার বিশেষ কারণ আছে। তুমি বিদ্যাপতিকে একথা জানিও। ললিতার মুখে এক অপার্থিব জ্যোতি ফুটে ওঠে।”

মহান মাধব তারে দেখাও সত্বর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর নাহিক সে পর॥
রাজীবলোচন সেই কৃষ্ণ গিরিধারী।
দেবতা দুর্লভ হরি মুকুন্দ মুরারি॥
ব্রজের বিহারী হরি দেব চক্রপানি।
যশোদা দুলাল সেই গোপ যদুমনি॥
দর্শন মানসে দ্বিজ ভীত ত্রস্ত অতি।
সদাই শঙ্কিত মন স্থির নহে মতি॥
যাও পিতা যাও তারে দেখাও দেবতা।
দুঃখিত অন্তরে রহে তোমার জামাতা॥

ললিতার কথা শুনে রাজা হঠাৎ চমকে ওঠেন। মনে ভাবেন তবে কি সময়কাল উপস্থিত? হে-নারায়ণ! আমি তোমায়

ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারবো না। বলে দাও, বলে দাও, হে মধুসূদন আমি কি করবো? না না, আমি দেবনা—দেব না ঐ মোহন মূরতি কৃষ্ণ কলেবর, না না কিছুতেই নয়। হঠাৎ তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আরক্ত নয়নে বললেন, "এতই সাহস তার? কপট ব্রাহ্মণ, তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে? তোমার কান্নায় আমার হৃদয় বিগলিত হবে আর আমি তাকে আমার হৃদয়ের ধন, একমাত্র সহায়, ইষ্টদেবকে দেখাবো? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি কন্যা যদি আমার ইষ্ট দেবতাও আমাকে নির্দেশ দেন তাহলেও আমি কৃষ্ণদেহ কাউকে দেখাবো না।"

পিতার কঠোর বাক্যে ললিতা দুঃখিত অন্তরে স্বামীর কাছে ফিরে এল। সজল নয়নে জানাল তার পিতার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা। তারপর মিনতির স্বরে স্বামীকে অনুরোধ করল, "তুমি এ আশা ছাড়। পিতা কোনমতেই তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন না।

ললিতার মুখে সবশুনে বিদ্যাপতি গভীর দুঃখিত ও বিচলিত হলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে ঐ কৃষ্ণদেহ দর্শন করবেন? বহুদিন গত হয়ে গেছে তিনি উড়িষ্যায় এসেছেন। এখন যথাসত্বর কাজ সমাধা করতে হবে। বিদ্যাপতি এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। কি করা যায়? কোন উপায় অবলম্বন করলে শীঘ্র ভগবানের সেই পবিত্র দেহ নীলাচলে নিয়ে যাওয়া যায়। একাজ তাকে করতেই হবে। বিদ্যাপতি ভাবতে থাকেন। এই ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন বিদ্যাপতি ললিতাকে বলল," ললিতা আমি প্রভাতে অজ্ঞাতে তোমার পিতার অনুসরণ করব। যেমন করেই হোক আমাকে কৃষ্ণদেহ কোথায় আছে তা জানতে হবে।"

প্রতিদিন বিদ্যাপতি ললিতার সাথে যুক্তি করেন। কিন্তু কোনও কুল কিনারা পাননা ললিতারও মনে সুখ নেই।

সারাদিন বিমর্ষ হয়ে থাকেন। স্বামীর উদ্‌বিগ্নতায় মন অতি বিচলিত। কিন্তু কোনও উপায় নেই। দিন দিন ললিতার দেহ শীর্ণ হতে থাকে।

সবই শবররাজ লক্ষ্য করেন। কিন্তু তিনি পিতার আদেশে যা সকলের অজ্ঞাতে রেখেছেন। কি করেই বা তা তিনি জামাতাকে দেখাবেন? তিনি মনে মনে চিন্তা করেন। তবে কি নারায়ণের ইচ্ছা। তিনি কি সত্যই নীলাচলে জগন্নাথ রূপে অধিষ্ঠিত হবেন? এই ব্রাহ্মণ কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কোনও প্রতিনিধি? হতেও পারে। সবই সেই করুণাময়ের ইচ্ছা। আমি ক্ষুদ্র মানুষ মাত্র। "মম ইচ্ছা সর্ব্ব-নাস্তি, হরি ইচ্ছা প্রবলম্" তিনি মনে মনে স্থির করলেন বিদ্যাপতিকে কৃষ্ণদেহ দেখাবেন। একদিন ললিতাকে ডেকে বললেন, "মা তুই এমন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিস্ কেন মা?"

ললিতা কোনও কথার জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা কন্যার মনগত ভাব বুঝতে পারেন। তিনি বললেন, "ললিতা আমি বিদ্যাপতিকে কৃষ্ণ দেহ দেখাবো।"

পিতার কথায় ললিতার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। বিশ্ববসু বললেন, "তবে আমার একটা সর্ত্ত আছে। জামাতা আমার সাথে যাবে কিন্তু তার দুচোখ বাঁধা থাকবে। আমার পিছনে একটা লাঠি ধরে তাকে যেতে হবে। একথা তাকে বলে দিও।"

ললিতা সেদিন রাত্রে পিতার সম্মতির কথা স্বামীকে জানালেন। বিদ্যাপতি ললিতার মুখে সবশুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌লেন। হে করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু, আমার মনবাসনা পূর্ণ করো প্রভু।

একদিন বিষ্ণুপর্বাহ একাদশীর প্রাতে বিশ্ববসু বিদ্যাপতিকে চোখ বাঁধা অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করলেন। যাবার সময়

অতিগোপনে ললিতা একমুঠো সরিষা স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, "এই সরিষা পথে ছড়াতে ছড়াতে যাবে। দেখো পিতা যেন না জানতে পারেন। পিতা জানতে পারলে তোমাকে তার ইষ্ট-দেবকে দেখাবেন না, মনে থাকে যেন।"

বিদ্যাপতি ললিতার কথা মত শবররাজের পশ্চাতে চলতে চলতে এই সরষে ছড়াতে লাগলেন। এইভাবে নিবিড় বনপথের ভিতর দিয়ে বহু কষ্ট করে বহুক্ষণ পরে বিদ্যাপতি বিশ্ববসুর সঙ্গে সেই পবিত্র অশ্বত্থমূলে এসে পৌছলেন। রাজা বললেন, "দেখ এই আমার ইষ্টদেব নীলমাধব। প্রণাম করো। তোমার বাসনা সফল হবে।

বিদ্যাপতি এই অপূর্ব অপরূপ মোহন মূর্ত্তি দেখে পুলকিত হলেন। তাঁর নয়নের অবিরল অশ্রুধারা ঝরতে লাগ্‌ল। তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে স্তুতি করতে লাগলেন।

হে রাধারমণ তুমি বৈকুণ্ঠের পতি।
ভকতবৎসল হরি অগতির গতি॥
সুন্দর সুরম্য সেই নীলগিরি পরে।
দেউল হয়েছে তব বসিবার তরে॥
সেথায় চলহে তুমি নন্দের কুমার।
তোমারে দর্শন করি জীবে হবে পার॥
প্রভু তুমি শোন নাকি আমার প্রার্থনা।
তোমারে লইতে আমি করি আনাগোনা॥
রমাপতি রাধানাথ চল ত্বরা করি।
অপেক্ষা করিছে সবে দেখিবে শ্রীহরি॥

স্তুতি শেষে বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করলেন, সন্ধ্যায় আবার বিশ্ববসু বিদ্যাপতিকে চোখবাঁধা অবস্থায় গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

সেইদিন রাত্রে ললিতা বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন

"স্বামী, আমাদের ইষ্টদেবকে কেমন দেখলেন ? বিদ্যাপতি সজল নয়নে বললেন

কি কহিব রূপ তার বর্ণিতে না পারি,
বিশাল শরীর সে যে মুকুন্দ মুরারি ॥
সুনীল কমল প্রায় মনোহর শোভা ।
অপরূপ তনু তার ঘনশ্যাম প্রভা ॥
অশ্বত্থের মূলে রাখি অপূর্ব মূরতি ।
সযতনে পাদ্যঅর্ঘ্যো পূজে বিশ্বপতি ॥

বিদ্যাপতির মুখে কৃষ্ণকলেবরের রূপ বর্ণনা শুনে ললিতার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরে গেল ।

"কৃষ্ণায় বাসুদেবা শরণ্যো পরমাত্মনে"
কংস কেশী নাশায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ ॥ "

(সাত)

বিদ্যাপতি সদাসর্বদা সেই অচিন্ত্য রূপ অন্তরের মধ্যে রূপায়িত করেন ! কিভাবে এই পুত কলেবর তিনি নীলাচলে নিয়ে যাবেন । সদাই তার এই একমাত্র চিন্তা কিছুদিন পর বিদ্যাপতির স্মরণ হয় সেই সরিষার কথা । যা তিনি ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন বনপথে। একদিন অপরাহ্ণে সকলের অলক্ষ্যে বিদ্যাপতি বেরিয়ে পড়েন সেই বনপথে। চলতে চলতে দেখতে পান যে সরিষা অঙ্কুরিত হয়েছে। তিনি সেই চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেন। অবশেষে তিনি বহুকষ্টে সেই অশ্বত্থমূলে উপস্থিত হলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণতি জানিয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু! কৃপাময়, করুণানিদান এস তুমি নীলাচলে জগন্নাথ রূপে বিরাজ কর সেথায়। কলির করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করো সমগ্র মানবকুলকে। পূর্ণ করো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের মনোবাসনা." সেদিন রাত্রে বিদ্যাপতি ললিতাকে বললেন "তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। আমি এই কৃষ্ণদেহ নীলাচলে নিয়ে যাব। এই কারণে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

ললিতা স্বামীর কথা শুনে আসন্ন স্বামী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মনে মনে যদিও দুঃখিত হল কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। শুধু মৃদুস্বরে একটি কথাই বলল, "স্বামী করুণাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" বিদ্যাপতি স্ত্রীকে বোঝালেন। এই কৃষ্ণদেহ কলিতে দারু কলেবর ধারণ করে পুরুষোত্তম রূপে নীলাচলে অধিষ্ঠিত থাকবেন। এই শ্রীভগবানের নির্দেশ। তিনি বললেন, "ললিতা তুমি এই মহান কাজে আমার সহায় হও তুমিও জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" ললিতা বললে, "আমি সর্বান্তকরণে তোমার কর্মে সহযোগিতা করব। স্বামী ; পিতা কিন্তু ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি এই পুতদেহ ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করে

আসছেন সকলের অজ্ঞাতে। তার অদর্শনে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন।”

বিদ্যাপতি বললেন, “দেখ ললিতা শবররাজের মতো মহামতি পুণ্যাত্মা যিনি এই শ্রীভগবানের দেহ এতদিন সযত্নে রক্ষা করে আসছেন তিনি নিশ্চয়ই এই কাজে বাধা দেবেন না। এ আমার স্থির বিশ্বাস।”

ললিতা বল্লে, “জানি, পিতা সমস্তই অবগত আছেন। কিন্তু তাহলেও তিনি যে সহজে এই দেহ নীলাচলে নিয়ে যাবার অনুমতি দেবেন তা আমার মনে হয় না।

বিদ্যাপতি বললেন, “না, তার অনুমতি নিয়ে এই কাজ করা যাবে না। তার অলক্ষ্যে আমাকে এই দেহ নিয়ে যেতে হবে।”

ললিতা সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। মুখে বললে “তা কি করে সম্ভব হবে?” বিদ্যাপতি বললেন, ‘আমি গভীর নিশীথে ঐ বনে অপেক্ষা করব। নিশা শেষে ব্রাহ্মী মূহূর্ত্তে আমি ঐ দেহ মহানদীতে ভাসিয়ে সমুদ্রপথে নীলাচলে নিয়ে যাব।” ললিতা স্বামীর কথায় আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে ঐ বিশাল দেহ তার স্বামী নিজে বহন করে নদীবক্ষে নিয়ে যাবেন? শ্রীভগবানের কৃপা হলে সবই সম্ভব।

সে বললে, “আমি তোমার ইচ্ছায় বাধা দেব না। বল, কিভাবে তোমার সহযোগিতা করতে পারি?”

বিদ্যাপতি বললেন, “জানি তোমার পিতা তোমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন। অনেক নির্য্যাতন করবেন। কিন্তু ললিতা তুমি কি সেই করুণাময়ের কৃপা মাথায় নিয়ে তা সহ্য করতে পারবে না?”

ললিতা তখন স্বামীর হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গাঢ়স্বরে বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি সকল

নির্য্যাতন হাসি মুখে সহ্য করব। এরজন্য যদি প্রাণও দিতে হয় তাও দেব। স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিনী সহযোগিনী, সহগামিনী, একথা আমি জানি স্বামী। তুমি যে মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েছ তা তুমি সফল কর।" ললিতার আশ্বাসে বিদ্যাপতি নিশ্চিন্ত হলেন এরপর একদিন শুভলগ্নে বিদ্যাপতি ললিতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

বিদায় দাও গো সখী আনন্দিত মনে।
যাই চলে যাই নিজ কর্ম সন্নিধানে॥
পাঠাল আমারে হেথা মালব ঈশ্বর।
লইতে মাধবে সে অতীব সত্বর॥
পূজিবে সকলে সেথা নানা উপাচারে।
জগন্নাথ নাম হবে বিশ্বের মাঝারে॥
সর্ব্বধাম শ্রেষ্ঠ হবে ধন্য সেই ধাম।
ত্রিজগতে খ্যাত হবে নীলাচল নাম॥

ললিতা সজল নয়নে চেয়ে থাকে নির্বাক, নিশ্চল, মুখে কোন কথা ফোটে না কি বলবে সে ? তার স্বামীযে মহান কর্ম যজ্ঞের আহ্বানে ছুটে চলেছেন তা থেকে তাকে নিবৃত্ত করা যায় না। তবু নিষ্ঠুর নিয়তির করাঘাতে স্বামী বিচ্ছেদের যে ব্যথা তার অন্তরের অন্তঃস্থলকে আলোড়িত করছে তাও ব্যক্ত করতে পারে না। তার সমস্ত হৃদয় মথিত করে যে দাবানল জ্বলে উঠেছে তা তার নয়নের জলে নিভাতে পারছে না। কিন্তু একি করছে সে স্বামীর জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন কি সে ব্যর্থ করে দেবে ? সামান্য পার্থিব সুখের জন্য সেকি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে ? না, না, তা সে কোনক্রমেই পারবে না। এর জন্য তাকে যত বেদনাই পেতে হক তা সে সব সহ্য করবে। হে নারায়ণ। হে দীনবন্ধু! শক্তি দাও প্রভু! তার মুখে ফুটে ওঠে স্বর্গীয় দীপ্তি নত

হয়ে স্বামীকে প্রণাম করে বলে, "হে প্রিয়তম, আমি তোমায় বাধা দেব না আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারি। অন্তে যেন তোমার চরণে মাথা রাখতে পারি।"

বিদ্যাপতি বললেন, "ললিতা যদি তোমার পিতার কঠোর কটূক্তি বা নির্যাতন অসহ্য হয় তবে এই মহানদীর তীরে তীরে সোজা নীলাচলে চলে এস। সেখানে আমার দেখা পাবে। মনে কোন সংশয় রেখ না। শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে তোমার সর্ব্ব সত্তা সমর্পণ করো। বিদায় প্রিয়তমে বিদায়।" এক মহিয়সী নারীর নির্নিমেষ দৃষ্টি পড়ে থাকে অপসৃয়মান স্বামীর গতিপথের উপর।

বিদ্যাপতি নিবিড় অরণ্য মাঝে প্রবেশ করলেন। সমস্ত বনভূমি অনুরনিত করে ভেসে উঠল তাঁর সুললিত স্বর।

তোমা লাগি এত পথ আসিয়াছি আমি।
ওহে প্রভু জগন্নাথ তুমি অন্তর্য্যামী॥
তোমারে লইতে পারি হেন শক্তি নাই।
আমি যে নিমিত্ত মাত্র নিজে চল যাই॥

বিদ্যাপতি প্রণতি জানালেন শ্রীপাদ চরণে। তারপর ধীরে ধীরে সেই পবিত্র দেহ আকর্ষণ করে মহানদীর জলে ভাসালেন।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু আনমনে হাসি।
আসিল দেবকী সুত নদী জলে ভাসি॥

ভাসতে ভাসতে শ্রীকৃষ্ণ দেহ নীলাচলে বাঙ্কিনদীর মোহানায় এসে পৌঁছল।

বিদ্যাপতির কর্ম সাধনা সফল হল

"সর্ব ধর্মান্ পরিতজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

**
*

(আট)

যথারীতি বিশ্ববসু প্রাতে স্নানাদি সমাপন করে ফুলের সাজি হাতে নিয়ে নীলমাধব পূজার জন্য কাননে প্রবেশ করল। কিন্তু এ কি ? কৃষ্ণদেহ কোথায় ? কে হরণ করল আমার ইষ্টদেবতা ? যাকে আমি সকলের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে এই নিবিড় বনে নিত্য পূজা করে আসছি। কোথা সেই মোহন মূরতি ? কোথায় তুমি দয়াময় ? সন্তাপহরণ ! বিশ্ববসু মর্মান্তিক বেদনায় ভেঙ্গে পরেন।

কোথা তুমি যদুপতি দেবকী নন্দন।
তাপস নীরবে করে সখেদ ক্রন্দন॥

শিরে করাঘাত করতে লাগলো। মনের মধ্যে সহসা সংশয় জাগে তবে কি বিদ্যাপাত হরণ করেছে আমার ইষ্টদেব ? চমকে ওঠে সাধু ? সে ছাড়া কেউত আর কৃষ্ণ দেহ দর্শন করেনি ? নিশ্চয়ই এ সেই কপট ব্রাহ্মণের কাজ !

বিশ্ববসু বাড়ী ফিরে ললিতাকে জিজ্ঞাসা করল, "বিদ্যাপতি কোথা ?" ললিতা নিরুত্তর। বিশ্ববসু সক্রোধে কন্যাকে নানাভাবে কটুক্তি করতে লাগল,

কোথা সে লম্পট হীন কপট ব্রাহ্মণ।
পলাইল লয়ে মোর মূরতী মোহন॥
নীচাশয় নরাধম সেই পাপাচারী।
করিল হরণ দেব মুকুন্দ মুরারি॥

সাধু নিদারুণ বাক্য বাণে জর্জরিত করে বলল, "দূর হয়ে যা তুই বাড়ী হতে। যেখানে সেই কপটাচারী ব্রহ্মণ গেছে সেখানে যা," ললিতা স্থির ভাবে নীরবে তাকিয়ে থাকে পিতার মুখের দিকে। কি বলবে সে ? তার স্বামীই ত' একাজ করেছে কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে। পিতার নিষ্ঠুর আঘাত সে সহ্য করতে পারে না। বেড়িয়ে

পড়ে সে বাড়ী হতে। সোজা চলে আসে মহানদী কূলে। নদীতীর ধরে ছুটে চলে ললিতা নীলাচল অভিমুখে

কয়েকদিন পর বিশ্ববসুর অন্তরে বিষাদের ছায়া নেমে এল। একে তার প্রাণসর্বস্ব কৃষ্ণদেহ অপহৃত তার উপর কন্যা ললিতা গৃহ পরিত্যক্তা। পিতৃহৃদয় অপত্য স্নেহে বিগলিত হয়ে যায়। নীলমাধব বিহনে তার মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল তা এখন বিধিনির্দিষ্ট বলে মনে হয়। মনে পড়ে পিতার আদেশ, এই কৃষ্ণ কলেবর তাকে সংরক্ষণ করতে হবে সকলের অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতে যতদিন না পাণ্ডুকুলতিলক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ দেহ নীলাচলে নিয়ে যান। কেননা এই দেহাস্থি থেকেই হবে কলির ত্রিতাপহারী দারুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথ। শবররাজ নিজেকে সংযত করেন। না-না-একি করছে সে? পিতার কঠিন নির্দেশ ও শ্রীভগবানের আপন ইচ্ছা সে অগ্রাহ্য করবে? এ পাপে যে তার অনন্ত নরকভোগ হবে। না-না-তা কখনই হবে না। মনে মনে গভীর ভাবে চিন্তা করে। এখন কি করবে সে? তবে কি ললিতাকে অনুসরণ করে নীলাচলে যাবে? যেখানে তার হৃদয়ের সর্বস্বধন নীলমাধব গেছেন। হ্যাঁ, তাই করবে সে। শেষে মনে মনে চিন্ত করে সে কন্যার অনুগামী হবে।

বিশ্ববসু বেরিয়ে পরে মহানদীর তীর ধরে নীলাচলের পথে।

ললিতা ছুটছে। উন্মাদিনীর মত ছুটছে। অন্তরে তার একমাত্র চিন্তা কি করে কবে সেই ত্রিলোক বাঞ্ছিত দারুমূর্ত্তি জগন্নাথের দর্শন পাবে।

ললিতা চলেছে সেই নদী তীর ধরি
কেমনে হেরিবে দেব মুকুন্দ মুরারি॥

শবররাজ বিশ্ববসুর অন্তরেও সেই একমাত্র চিন্তা কেমন করে সে দর্শন করবে সেই নীলাদ্রি শোভন দেব দুর্লভ দারুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথ।

পিতা পুত্রী ছুটছে। উভয়ের একই চিন্তা। জগন্নাথ দর্শন। গন্তব্য স্থান নীলাচল।

এদিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্ত্রী পাত্র, মিত্র, সভাসদ, সৈন্য সামন্ত নিয়ে নীলাচলে অপেক্ষা করেছেন।

বিদ্যাপতি গেল ত্বরা নৃপতির পাশে।
মনের হরষে কহে তাহার সকাশে ॥
হেথায় আসিল রাজা প্রভু জগন্নাথ।
পুরিল বাসনা তব পূর্ণ মনোরথ ॥
বহুকষ্টে আনিয়াছি অতি সঙ্গোপনে।
তপশ্রেষ্ঠ বিশ্ববসু নাহি তাহা জানে ॥

বিদ্যাপতির নিকট শ্রীভগবানের আগমন সংবাদ শুনে মহারাজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। অতি সত্বর দাস দাসী, সৈন্য-সামন্ত, নিয়ে রাজা ছুটে এলেন বাঙ্কি নদীর মোহনায়। ভক্তি সহকারে প্রণাম জানালেন পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে। তারপর সেই বিশালদেহ অতি সন্তর্পনে নিয়ে এসে রাখলেন শ্রীগুণ্ডিচা মণ্ডপে অতি গোপনে।

হবে প্রভু জগন্নাথ দেব আবির্ভাব।
খণ্ডিবে সকল পাপ হেরি পদ্মনাভ ॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে সেই অচিন্ত্য মূর্ত্তি নির্মাণ হবে। মূর্ত্তিনির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন বহু শিল্পী ও কারিগরদের। তারা জানতে চাইল কিরূপ মূর্ত্তি নির্মাণ হবে।

সাদা, কাল, পীতরং কি হইবে তার।
ছোট, বড়, মধ্য কিংবা আকৃতি তাহার ॥
সাত্ত্বিক হইবে কিংবা রাজসিক রূপ।
তামসিক রূপ করি বল তুমি ভূপ ॥
শম, দম, সুকোমল কিবা সে প্রকার।
গড়িব বৌদ্ধ রূপ জানি সে আকার ॥

রাজা মহা সমস্যায় পড়লেন। তিনি নিজেই জানেন না যে কিরূপ মূর্ত্তি হবে। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, "দেখ তোমরা শিল্পী এসম্বন্ধে তোমাদের প্রচুর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে অতএব তোমাদের মনমত মৌন মূর্ত্তি নির্মাণ কর।

মহারাজের নির্দেশে শিল্পীগণ সেই পুতদেহ যজ্ঞাগার শ্রীগুণ্ডিচা মণ্ডপ হতে বহিরাঙ্গনে আকর্ষণ করে ছেদন করবার ব্যবস্থা করল। যখনই তার সেই দেহের উপর কুঠারাঘাত করল তখনই সেই কুঠার ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। এবং বহু শিল্পী কুঠারাঘাতে অঙ্গহীন হয়ে পড়ল। তখন সমস্ত শিল্পীর মনের ভীতির সঞ্চার হল। তারা ভাবল ভগবানের শ্রী অঙ্গে কুঠারাঘাত করার পাপে তাদের ঐ অবস্থা হয়েছে। সকলে রাজার নিকট ছুটে গেল। অনুনয়ের সঙ্গে বলল, "মহারাজ! একাজ আমরা করতে পারবো না! আমাদের অব্যাহতি দিন। দেখুন আমাদের কি অবস্থা হয়েছে। অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে" তারা অক্ষমতা জানিয়ে চলে গেল।

শিল্পীদের কথা শুনে রাজা আবার এক নতুন সমস্যায় পড়লেন। আবার কি হবে? হে নারায়ণ! হে করুণা সাগর, আমার কি অপরাধ? বল, বল, দেব কিভাবে তোমার মূর্ত্তি নির্মাণ হবে? তুমিত অন্তর্য্যামী প্রভু। তোমার ত কিছুই অজানা নেই। হে মাধব কৃপা করে উপায় বলে দাও। রাজা শ্রী ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

শুদ্ধ চিত্তে ডাকি প্রভু শ্রীমধুসূদন।
প্রকটিত হও তুমি শ্রীবংশীবদন॥
তোমার মূরতি তুমি করহে নির্মাণ।
ত্রিতাপহারী হে তুমি সর্ব্বশক্তিমান॥
গোপীগুণনিধি তুমি নিকুঞ্জবিহারী।
যশোদাদুলাল তুমি ব্রজবংশধারী॥

কংশকেশী নাশি তুমি করুণানিদান।
দীনবন্ধু কর তুমি আর্তে পরিত্রাণ॥
কঠিন এ কাজে তুমি দাও নিজ হাত।
নীলাদ্রির পতি তুমি করি প্রণিপাত॥

ভক্তিরসে রাজার অন্তর ভরে গেল। অন্তার্য্যামী নারায়ণ ভক্তের আর্কষণে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি যে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু। তিনি ভক্তের এই আর্ত আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না। তিনি দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে আদেশ দিলেন, নীলাচলে দারুমূর্ত্তি নির্মাণের জন্য। শ্রীভগবানের আদেশে শিল্পী বিশ্বকর্মা ছদ্মবেশে এক অতি বৃদ্ধের বেশ ধরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ সভায় উপস্থিত হলেন। রাজাকে জানালেন যে তার ইপ্সিত দারুমূর্ত্তি নির্মাণ করবেন।

রাজা বৃদ্ধকে দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি? মূর্ত্তি নির্মাণের কথা তুমি কি করে জানলে?"

বৃদ্ধ উত্তর দিল, "রাজা আমি বহু পূর্বেই এই মূর্ত্তি নির্মাণের কথা শুনেছি। কিন্তু আমার বাড়ী অনেক দূরে তাই আসতে বিলম্ব হল।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন" তোমার নাম কি?" বৃদ্ধ বললেন, "আমার নাম অনন্ত মহারাণী আমি বহু মূর্ত্তি নির্মাণ করেছি। বাল্যকাল হতে আমি এই কাজ করে আসছি।" রাজা বললেন, "তুমি অতি বৃদ্ধ. কি করে এই দারু মূর্ত্তি নির্মাণ করবে?"

বৃদ্ধ বললেন, "মহারাজ, আমি বৃদ্ধ হলেও পূর্ণ কর্মক্ষম। আমাকে বিশ্বাস করুন।" মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন লক্ষ্য করলেন এই বৃদ্ধের চোখে এক অলৌকিক দীপ্তি। তার মনে আস্থার ভাব সঞ্চার হল। তিনি শিল্পীকে পরীক্ষা করার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি একা এই মূর্ত্তি নির্মাণ করবে?" শিল্পী বললে, "মহারাজ, আমি একাই মূর্ত্তি নির্মাণ করবো, তবে এ বিষয়ে আমার কিছু সর্ত্ত আছে।"

রাজা বললেন, "বল তোমার কি সর্ত্ত? শিল্পী বললেন "মহারাজ প্রথম নির্দ্দিষ্ট দারু সংগ্রহ করতে হবে। এই দারু রসাল, চন্দন, নিম্ব, কিংবা দেবদারু বৃক্ষের হওয়া চাই। এই নির্দিষ্ট বৃক্ষের সন্ধান করতে হবে। বৃক্ষটি নদীতটে অবস্থিত হবে, এবং দারু অঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে। বৃক্ষতলে বল্মিক স্তুপ থাক্‌বে। বৃক্ষতলে সর্পের বাসা থাকবে বৃক্ষ সন্নিকটে শশ্মান, আশ্রম ও সরোবর থাকবে। বৃক্ষের মূল ও কাণ্ডের মধ্যভাগ উচ্চতায় আট দণ্ডের বেশী হবে না। শাখায় কোনও পক্ষীর বাসা থাকবে না বা লতাপাতা কিছুই জড়িয়ে থাকবে না। এই সমস্ত চিহ্ন থাকলে তার তলে যজ্ঞ করতে হবে। তারপর প্রথমে স্বর্ণকুঠার দ্বিতীয় রৌপ্যকুঠার এবং তৃতীয় লৌহকুঠার দিয়ে ছেদন করতে হবে। পরে ঐ দারু মণ্ডপে আনয়ন করতে হবে।"

রাজা উদগ্রীব হয়ে শিল্পীর কথা শুনতে থাকেন। শিল্পী বলে চলে, আমার দ্বিতীয় সর্ত্ত হল, "আমি যখন মূর্ত্তি নির্মাণ করবো তখন মণ্ডপের দ্বার সম্পুর্ণ বন্ধ রাখতে হবে এবং বাহিরে যজ্ঞাদির আয়োজন করতে হবে। নানা বাদ্য, গীতাদি, ও বেদপাঠ করতে হবে। সকলের অলক্ষ্যে এই মূর্ত্তি নির্মাণ করা হবে। পনের দিন মন্দির দ্বার সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। কোন ক্রমেই দ্বার উন্মুক্ত করা যাবে না। যদি কেহ দ্বার উন্মুক্ত করে বা মূর্ত্তি নির্মাণ করা দেখে তবে সে তৎক্ষণাৎ অন্ধ হয়ে যাবে। আর মূর্ত্তি নির্মাণ অসমাপ্ত থাকবে। এই সমস্ত সর্ত্তরক্ষার দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।"

রাজা সর্ত্তগুলি মেনে নিলেন। তিনি রাজকর্মচারীদের ডেকে আদেশ দিলেন কঠোরভাবে এই সর্ত্তগুলি রক্ষা করা চাই। যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে।

রাজার মন থেকে কিন্তু চিন্তা দূর হলনা। তিনি ভাবতে

লাগলেন এই বৃদ্ধশিল্পী কিছু আহার না করে কি করে মূর্ত্তি নির্মাণ করবে। রাজার চিন্তা বৃথা, কেননা যে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার দেহ পঞ্চতত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তেজপুঞ্জময় দেহ সুধাপানে তিনি অবিনশ্বর। যে কোন সময়ে যে কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন।

সুধামৃত পান করি আনন্দে যে রয়।
তাহার সে ক্ষুধা তৃষ্ণা কভু নাহি হয়॥
পঞ্চতত্ব অন্তর্গত শরীর যাহার।
ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভূতি হয় যে তাহার॥

রাজার আদেশে বহু শিল্পী কারিগর চতুর্দিকে সেই চিহ্নিত দারু মূর্ত্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। অনেক অনুসন্ধানের পর দণ্ডকারণ্যে সেই চিহ্নিত বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া গেল। যথা নিয়মে সেই বৃক্ষতলে যজ্ঞের আয়োজন করা হল। রাজ পুরোহিত সহ দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করলেন। তারপর এক শুভমুহূর্ত্তে প্রথমে স্বর্ণকুঠার, এবং পরে রৌপ্য ও লৌহকুঠার দিয়ে সেই বৃক্ষ ছেদন করা হল। ঐ বৃক্ষের শাখা দ্বারা এক বৃহৎ শকট নির্মাণ করা হল। এবং ঐ পবিত্র দারু হোড়ি গীতধ্বনির মধ্য দিয়ে শবরগণ কর্তৃক যজ্ঞমণ্ডপে নিয়ে আসা হল। মণ্ডপের চারি দ্বার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। সমগ্র যজ্ঞাগারের বাহিরে পবিত্র বৈদিক মন্ত্রধ্বনি, নানাবিধ বাদ্যাদির মাধ্যমে সুললিত নামগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

মণ্ডপ মধ্যে বৃদ্ধ শিল্পী আপন মনে কলির মৌন জগন্নাথের মূর্ত্তি নির্মাণে নিমগ্ন হলেন। পার্থিব কলকোলাহলের অন্তরালে, নির্জন নিভৃতে, সমস্ত প্রাণী জগতের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে শিল্পী তার কাজ করে চলেছেন। সমগ্র দিবারাত্রি ধরে বিরামহীন শিল্পী শ্রীভগবানের মূর্ত্তি নির্মাণ করছেন।

প্রকটিত হবে সেই প্রভু জগন্নাথ।
অযোনি সম্ভূত মৌন কলির শ্রীনাথ॥
আনন্দিত হয়ে অতি যত দেবগণ।
দুন্দুভি বাজায়ে করে পুষ্প বরিষণ॥
নানা রঙ্গভঙ্গে নাচে কিন্নরী অপ্সরা।
জন্ম লবে জগন্নাথ করি পুতধরা॥

এস, ! এস প্রভু, পতিতপাবণ, বিপদবারণ, কলুষনাশন ! অরূপের রূপ ধরি কলিতে জীবমুক্তি কল্পে প্রকটিত হও এই নীলাচলে। ধন্য হক পূণ্য হক, তৃপ্ত হক এই তাপতপ্ত বসুন্ধরা।

"যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্"

(নয়)

সতী সাধ্বী মহিয়সী নারী মহারাণী গুণ্ডিচা দেবী প্রতিদিন প্রাতে মণ্ডপ দ্বারে করজোড়ে প্রার্থনা জানান।

জয় জগদীশ হরি জগন্নাথ স্বামী।
দৈত্যাহারী দয়াময় তুমি অন্তর্য্যামী॥
কৃপা মোরে কর প্রভু দাও দরশন।
পতিত পাবণ হরি দেব নারায়ণ॥

নিয়ত তিনি দিন গণনা করেন, কবে তার অন্তর দেবতা কৃপা করে দর্শন দেবেন, কবে সেই ব্রহ্ম সনাতন দারুমূর্ত্তির আবির্ভাব হবে কবে তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে? এইভাবে মহারাণী তার আর্ত্ত আহ্বান শ্রীভগবানের চরণকমলে নিবেদন করেন। তার পার্থিব কামনা, বাসনা, আহার, নিদ্রা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি কেবল দিবারাত্র নারায়ণের ধ্যান করেন। তার এইমাত্র চিন্তা, কবে সেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রীমধুসূদন দারুমূর্ত্তি ধারণ করে কলিতে জীবমুক্তি কল্পে নীলাচলে বিরাজিত হবেন। এক একটি দিন যায় আর মহারাণী শ্রীমূর্তি দর্শন আকাঙ্খায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন ক্রমশ মণ্ডপমধ্যস্থ শিল্প কর্মের শব্দ ক্ষীন হতে ক্ষীনতর হয়ে আসে মহারাণী ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়লেন। পনের দিনের দিন মহারাণী একেবারে উন্মাদিনী হয়ে উঠলেন। মণ্ডপ মধ্যস্থ শব্দ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত আকাশ ও বাতাসের মধ্যে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্যের ভাব। পশুপক্ষী সহ সমস্ত প্রাণীজগত নীরব।

মহারাণী বারবার মহারাজের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছেন মণ্ডপের দ্বার উন্মোচনের জন্য। মহারাজ মহারাণীর কথায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তিনি ধীরস্বরে বললেন, "তা কি করে হবে? আজও পনের দিন শেষ হয়নি, শিল্পীর কথা অনুযায়ী মণ্ডপের দ্বার খোলা নিষেধ।"

মহারাণী বললেন, "নিশ্চয়ই শিল্পী কোন দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েছে। দেখছেন না মণ্ডপ মধ্যে শিল্প কর্মের শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে? শীঘ্র মণ্ডপ দ্বার খোলার আদেশ দিন।" মহারাজ পুনরায় বললেন, "রাণী মন দিয়ে শোন, এই কলেবর সৃষ্টি হবে এক মহামূল্য "জন্মরঙ্গের" সর্বশ্রেষ্ঠ বিভূতি দিয়ে অতএব যতক্ষণ না শিল্পীর কাজ শেষ হয় ততক্ষণ দ্বার খোলা উচিত নয় কোন বিঘ্ন হতে পারে। কাল প্রাতে দ্বার খোলা হবে তুমি একবার অন্তরে ভেবে দেখ, মহাগুণী শিল্পীর কথা অমান্য করলে হয়ত আমাদের কোনও অনিষ্ঠ হতে পারে।"

রাণী বললেন, "অতি বৃদ্ধ এই শিল্পী হয়ত অনাহারে মণ্ডপ মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে। মণ্ডপমধ্যে কোনও শিল্পকর্মের শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। এ আপনার বৃথা সংশয় রাজা দ্বার খোলবার আদেশ দিন। আমি দারুব্রহ্ম সনাতন মোহন মূর্ত্তি দর্শন করে আমার মনবাসনা পূর্ণ করি।

রাণীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে রাজা ক্ষণকালের জন্য মোহগ্রস্ত হলেন। তিনি অবিলম্বে মণ্ডপদ্বার খোলার আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে পনের দিনের দিন মণ্ডপ দ্বার খুলে দেওয়া হল। কিন্তু একি দেখছেন রাজারাণী? পাশাপাশি চারটি অসমাপ্ত দারুমূর্ত্তি। বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথ ও সুদর্শন। শিল্পী অন্তর্ধ্যান করেছে। মণ্ডপ মধ্যে কোথাও তাকে খুজে পাওয়া গেল না। তবে কি শুন্য হতে এই মূর্ত্তি মণ্ডপে প্রবেশ করেছে। হস্ত, পদ, গণ্ড, কর্ণহীন বিকলাঙ্গ মূর্ত্তি। রাজা কপোলে করাঘাত করে আর্তনাদ করে উঠলেন, প্রভু! তোমার একি লীলা!

অর্দ্ধ হস্ত পদ মূর্ত্তি পূর্ণ নহে তনু।
অঙ্গহীন ব্রহ্মা বিষ্ণু বিকলাঙ্গ স্থাণু॥

চমকিত হল দেখি রাণী ও নৃপতি।
গভীর দুঃখেতে হৃদি ভারাক্রান্ত অতি॥
পূজা যোগ্য নহে এ খণ্ডিত মূরতি।
রূপ দেখি ভয়ে ভীত হল নরপতি॥

ঠিক ঐ সময় দৈববানী শোনা গেল—"মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন উদাস বা উদ্বেগে চঞ্চল হয়োনা। এ তোমার অর্জিত কর্মের ফল। এই সেই চির আকাঙ্খিত চির বাঞ্ছিত মৌন মূর্ত্তি "জগন্নাথ"।

জগন্নাথ, বলদেব সুভদ্রা মূরতি।
ত্রিমূর্ত্তি মিলিয়া এক বৈকুণ্ঠ শ্রীপতি॥
দারুব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু বাসুদেব।
পুজ তুমি শুদ্ধ চিত্তে তব ইষ্টদেব॥

রাজা দৈববানী শুনে বিস্মিত হলেন তিনি মনে মনে স্থির করলেন এই খণ্ড মূর্ত্তিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজা করবেন। এই হল তার প্রতি শ্রীভগবানের নির্দেশ "মম ইচ্ছা সর্বনাস্তি হরি ইচ্ছা প্রবলম্" মহারাণী রাজাকে তিনখানি রথ প্রস্তুত করতে বললেন। এক একটি রথে এক একটি মূর্ত্তি বসিয়ে শ্রীমন্দিরে নিয়ে যাওয়া হবে মহারাজের আদেশে বারশত শিল্পী কারিগর দ্বারা তিনখানি অতি সুন্দর রথ নির্মাণ করা হল। জগন্নাথদেবের রথের নাম "নন্দিঘোষ"। বলদেবের রথের নাম "তালধ্বজ" এবং সুভদ্রার রথের নাম "দেবদলন' বা "বিজয়"। কিন্তু এক মহা সমস্যার উদয় হল। পথমাঝে মহোদধী মুখে সারদা নদী প্রবাহিতা। কি করে রথ পার করে নিয়ে যাওয়া হবে? সমস্যার সমাধান করলেন 'মহামন্ত্রি' তিনি বললেন ছয়খানি রথ প্রস্তুত করা হোক। তিনখানি এপারে তিনখানি ওপারে। রাজাও মন্ত্রির সঙ্গে একমত হলেন। সেই অনুযায়ী ছয়খানি রথ প্রস্তুত করা হলো। শুভ

অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে আরম্ভ করে পূর্ণ ষাট দিবস ধরে দিবারাত্র কর্ম করে আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন রথের নির্মাণ কার্য্য শেষ হল। ঐ দিনই এক শুভক্ষণে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথারোহনে শ্রীমন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন। মহারাণী শ্রীগুণ্ডিচা দেবীর স্মারক হিসাবে এই রথযাত্রার নাম হল "শ্রীগুণ্ডিচা যাত্রা।" যথাবিহিত নৌকা যোগে নদী পার করে আবার রথে বসিয়ে মন্দির সম্মুখে নিয়ে আসা হল।

রাজ আদেশে 'ঝগরু' পাণ্ডা এল পুত্তাচারে মুর্ত্তি বন্দনা করে মন্দির অভ্যন্তরে রত্ন সিংহাসনে বসানোর জন্য, দক্ষিণে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা এবং উত্তরে জগন্নাথ ও সুদর্শন। সুদর্শনের সামনে রাখা হল আর একটি ছোট জগন্নাথের মুর্ত্তি সেটি কোনদিনই সিংহাসন হতে নামেন না। জগন্নাথের বামে লক্ষ্মী ও দক্ষিণে ভূদেবী। এই জন্য রত্ন সিংহাসনের আর এক নাম "সপ্তাসন।"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বয়ং শ্রীজগন্নাথের শিরে ছত্র ধরলেন। মহারাণী শ্রীগুণ্ডিচাদেবী পবিত্র বরণডালা হাতে নিয়ে শ্রীভগবানের স্তুতি করে মাল্য দিয়ে বরণ করলেন।

বাজাইয়া নানা বাদ্য, শঙ্খ, ভেরি, তুরী।
শ্রীখোল, মৃদঙ্গ আদি দুন্দুভি বাঁশরী॥

চামর ব্যজন করে যত ভক্ত গণে।
বসিল ঠাকুর আসি রত্ন সিংহাসনে॥

অপরূপ দৃশ্য সে অপূর্ব সুন্দর।
রত্নাসনে লক্ষ্মী পতি রূপ মনোহর॥
দর্শন করিয়া সেই কমল লোচন।
প্রেমে গদগদ চিত্ত লোক সর্ব্বজন॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আর শ্রীগুণ্ডিচা রাণী।
দেখিয়া মোহিত হল দেব চক্রপানি॥

মহানন্দ ভক্তিচিত্তে করি দরশন।
পুলকে ভরিয়া উঠে উভয়ের মন॥
পূরিল কামনা আজি অন্তর বাসনা।
প্রণতি জানায় তারা দেব কালাসোনা॥

শ্রীভগবানের দেহাস্থি সহযোগে এই ত্রিমূর্ত্তি দারুব্রহ্ম সনাতন রূপে শ্রীমন্দিরে স্থাপিত হল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্ন বাস্তব রূপে প্রকটিত হয়ে সাফল্য মণ্ডিত হল ঐ মূর্ত্তি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যথাবিহিত শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যুগে যুগে পূজিত হয়ে আসছেন। সমস্ত পূজা পদ্ধতি "মাধলা পাঁজি" নামে রাজকীয় নিত্য বিধি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হল। আজও শ্রীজগন্নাথের নিত্যকর্ম, ভোগরাগাদি ঐ "মাধলা পাঁজি" অনুসারে হয়ে আসছে। দারুব্রহ্ম সনাতন শ্রী'জগন্নাথ' দর্শন মাত্র কলিতে জীবের সর্ব্বপাপ নাশ হয়।

"পাপহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব পাপ হর হরি।"

বিশ্রাম

(দশ)

বিশ্ববসু ও ললিতা শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্খায় আকুলিত চিত্তে নীলাচলে প্রবেশ করল। এসে তারা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল পথে বহু লোক মাথায় মাটির "আটিকা" নিয়ে চলেছে শ্রীমন্দির অভিমুখে নীলাচল বাসীরা ভারে ভারে চাল, ডাল, ঘি, শাক, শব্জি, ফল, মূল, পুষ্প চন্দন এবং নানাবিধ পূজা উপাচার নিয়ে আসছে দেউল প্রাঙ্গণে। চারিদিক যেন একটা মহাযজ্ঞের কর্মকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকলেই সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেছে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবায়। মন্দির মার্জন হতে আরম্ভ করে ভোগপূজার এক বিরাট আয়োজন চলেছে। কর্মব্যস্ততায় আজ সমগ্র নীলাচল সরব।

শবর শবরী দেখি চমকিত সবে।
ছুটিয়া আসিল লোক বহু কলরবে॥
কেহ বলে কোথা ঘর কিবা পরিচয়।
দেখিতে বাসনা নিত্য একত্রে উভয়॥
নানাবিধ বাক্যালাপে হল পরিচিত।
নৃপতি সকাশে চল কহে জরাসুত॥
সকল লক্ষণ শুভ সুকল্যাণ ময়।
দেখি পুলকিত বসু মহা সমন্বয়॥

এই পরিবেশের মধ্যে এক বিচিত্র বেশ ধারী শবর শবরী দেখে লোকে বিস্মিত হয়। প্রশ্ন জাগে, "কে এরা?" কোথা হতে এল?" পরিচয়ে জানতে পারল এরা শবর শবরী। মহানদী কুলস্থিত কন্টিলা গ্রাম হতে এসেছে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের আশায় কিরাত বেশধারী শবর শবরীর আগমণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা নীলাচলে। বিদ্যাপতি বুঝতে পারেন এরা আর কেউ নয় স্বয়ং শবররাজ বিশ্ববসু ও তার কন্যা ললিতা। তিনি মহারাজকে সংবাদ দেন সে তার মিত্র বিশ্ববসু, কন্যা ললিতাকে

নিয়ে নীলাচলে এসেছে জগন্নাথ দর্শনে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এ সংবাদে আনন্দিত হয়ে কাল বিলম্ব না করে পাত্র মিত্রদের নিয়ে মিত্রবরকে নিয়ে সাদর আহ্বান জানাতে স্বয়ং নগরদ্বারে উপস্থিত হলেন। বিশ্ববসুকে দেখে সাদর আলিঙ্গনে বদ্ধ করে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সাদর আহ্বানে বিশ্ববসু পুলকিত হলেন ও তার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। রাজা তাদের সমাদরে নিয়ে এলেন অতিথি শালায়।

অতিথি আপ্যায়ন শেষ হলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "মিত্র কি প্রয়োজনে তুমি সকন্যা 'নীলাচলে' এসেছ? বিশ্ববসু' বললেন "রাজা তুমিত সবই জান, কৃষ্ণদেহ আমি ইষ্টদেব জ্ঞানে "নীলমাধব" নামে এতদিন পূজা করে এসেছি। সেই পবিত্র দেহাস্থি সহযোগে দারুমূর্ত্তি জগন্নাথ রূপে রূপান্তরিত হয়ে এই নীলাচলে বিরাজ করছেন। আমার একমাত্র বাসনা সেই কৃষ্ণ কলেবর দারুমূর্ত্তি দর্শন করে নয়ন সার্থক করি।

মিত্রের কথায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি আনন্দিত হয়ে বললেন, "হে তাপস! তুমি মহাভাগ্যবান। তুমি নীলমাধব রূপে সেই কৃষ্ণ ভগবানের চরণে নিত্য পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেছ। তোমার প্রতি তাঁর অপার করুণা। তোমার নাম ত্রিজগতে দেব, দৈত্য, নর সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে"। বিশ্ববসু বলল, "মিত্রবর, তোমার অপূর্ব কীর্ত্তি তোমাকে চির অমর করে রাখবে। তুমি নির্মাণ করেছ শ্রীশ্রীভগবানের দারুমূর্ত্তি যা কলিতে দর্শন মাত্রই জীবমুক্তি পাবে।

এইভাবে দুইমিত্র আলাপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর রাজা বিশ্ববসুকে নিয়ে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

বসুকে কহিল নৃপ শোন মিত্রবর।
এই তব ইষ্টদেব কৃষ্ণ কলেবর॥
মৌনমূর্ত্তি দারুময় দেব জগন্নাথ।
তোমার সেবিত ইষ্ট যদু গোপীনাথ॥
ভক্তে তরিবার তরে হেথায় বিরাজে।
ধরিয়া অরূপ তনু অপরূপ সাজে॥
একদেহ জগন্নাথ কৃষ্ণ ভগবান।
দারুব্রহ্ম সনাতন মূরতি মহান॥
কর মিত্র প্রণিপাত চরণ কমলে।
সংশয় না রাখি হাতে আসি নীলাচলে॥

পরম শ্রদ্ধায় ভক্তি নম্র চিত্তে বিশ্ববসু প্রণাম করলেন। অন্তর তার ভরে উঠল এক অবর্ণণীয় পুলকে। পূর্ণ হল তার সকল বাসনা। সার্থক হল কৃষ্ণপদ সেবা। ধন্য হল হৃদি মন প্রাণ। ললিতা অপলক নয়নে চেয়ে আছে দারুমূর্ত্তির দিকে। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা। কণ্ঠে ফুটে উঠেছে সেই পরমানন্দের বন্দনা।

জয় জগন্নাথ তুমি জগতের পতি।
জয় বলভদ্র জয় দেব মহামতি॥
জয় জয় গুণবতী সুভদ্রভগিনী।
জয় শ্রীবিমলা বলভদ্র সোহাগিনী॥
জয় জয় লক্ষ্মী তুমি জয় বিষ্ণুপ্রিয়া।
সরস্বতী আদি দেবী রূপে অদ্বিতীয়া॥
সুদর্শন করে দেব নীলাচল পতি।
বিরাজিছে সহ কোটি দেবদেবী সতি॥

সেদিন সন্ধ্যায় রাজারাণী বিশ্ববসু ও ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এলেন। শ্রীভগবানের চরণে মিনতি জানিয়ে নানা স্তুতি করলেন। তাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে সেই

মৌন মূর্ত্তি প্রকটিত হল।

প্রকটিত হল প্রভুদেব জগন্নাথ ॥
হাসিয়া কহিল তুমি শোন নরনাথ।
তোমার ভকতি দেখি সন্তুষ্ট অন্তর।
মাগ তুমি মম পাশে যথা ইচ্ছা বর।

সন্মুখে চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখে রাজা, রাণী, ললিতা ও বিশ্ববসু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। রাজা বললেন, "হে দেব করুণার অবতার, দীনবন্ধু, দরিদ্রের নাথ; কৃপা করে যদি দর্শন দিয়েছ, তবে আমাদের এই বর দাও যেন আমরা অন্তে তোমার ঐ রাতুল চরণে স্থান পেতে পারি। জন্ম মৃত্যু রহিত হয়ে আমাদের সমস্ত আত্মসত্ত্বা তোমাতে বিলীন হয়ে যায় এই একমাত্র কামনা আমাদের। "শ্রীভগবান বললেন, "তাই হোক তোমরা আমার রত্নাসন তলে রূপায়িত হয়ে চির অমরত্ব লাভ কর। ললিতা ও বিশ্ববসুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি বর চাও?

বিগলিত অশ্রু ললিতা ও বিশ্ববসু অতি বিনিত ভাবে জানাল, "প্রভু, তোমার অদেয় কিছুই নাই। তুমি কৃপা করে এই বর দাও যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার চরণ সেবা করতে পারি।"

ভগবান বললেন, শোন শবরপতি, তোমরা কলিতে আমার পরম ভক্ত ও শ্রেষ্ঠ সেবক রূপে পরিগণিত হবে। বংশ পরম্পরায় দৈতাপতি অর্থাৎ দুহিতাপতি নামে জনসমাজে পরিচিত হবে। আর অন্তে আমাতেই গতি হবে।" চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অন্তর্ধান করলেন। ভক্তের ভগবান ভক্তের বন্ধনে বাঁধা। তিনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। তিনিও আকর্ষণ করেন ভক্তকে সদা সর্বদা। আজ পরম ভক্ত নৃপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ও ভক্তিসার স্বরূপিনী

রাণী শ্রীগুণ্ডিচা দেবী শ্রীকৃষ্ণ চরণে অনন্তকালের জন্য বিশ্রাম নিলেন।

আর শবররাজ বিশ্ববসু ও কন্যা ললিতা শ্রীভগবানের সেবক রূপে অনন্তকালের জন্য তার শ্রীচরণ কমলে অর্ঘ্য নিবেদন করে চির অমরত্ব লাভ করলেন ভগবানই ভক্তের একমাত্র আশ্রয়।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাচী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যাসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ"॥

(এগার)

পাণ্ডুকুল তিলক মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন চন্দ্র বংশের শেষ নৃপতি। মহাপুন্যবান, পরমধার্মিক ও ভগবত ভক্ত। মহারাণী গুণ্ডিচা দেবীও ভক্তিমতি, সতী সীমন্তিনী ও স্বামী সোহাগিনী মহিয়সী নারী। শ্রীভগবানের চরণে সদা শুদ্ধমতি তাদের উভয়ের অন্তরের কামনা ছিল শ্রীকৃষ্ণ পদে আশ্রয়। বাঞ্ছা কল্পতরু, পরমকরুণাময় শ্রীহরি কারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই তাঁর অকৃপণ কৃপা বর্ষিত হল এই রাজদম্পতির মাথায়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বাপর ও কলি মধ্য সন্ধ্যাযুগে নির্মাণ করলেন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির। কলিতে পাপমুক্তির মূর্ত্ত প্রতীক অরূপের রূপ, কৃষ্ণ কলেবর, দারু ব্রহ্ম সনাতন প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীমন্দিরে। আর ঐ মন্দির জগতে চির অমর করে রাখলো রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও রাণী গুণ্ডিচা দেবীকে। ছড়িয়ে পড়ল দগ্ধ পৃথিবীর বুকে শান্তির অমিয় ধারা।

কিন্তু ঐ মন্দির কালের কপোল তলে প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল। কালের এই করাল ছায়ায় অন্তরে হেসে উঠলেন মৌনমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথ। বহুযুগ পরে আবার এক মহালগ্নে শ্রীমন্দির আপন গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তুলে ধরল তার গগনস্পর্শি শির।

এভাবে হয়েছে কত কর্মকাল ক্ষয়।
আবার আসিল ভবে সে শুভ সময়॥
যযাতি কেশরি রাজা গুপ্তবংশ জাত।
জাজপুর অধিপতি অতীব বিখ্যাত॥
মন্দির নির্মাণ করে পুনঃ সে রাজন।
সুন্দর সুরম্য অতি অপূর্ব দর্শন।
আনন্দিত হল সবে দেখিয়া দেউল।
অতি অপরূপ শোভান্বিত সিন্ধুকুল॥

মহারাজ যযাতি কেশরি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা। ধর্মে তার অতীব শ্রদ্ধা। দেব দ্বিজে অগাধ ভক্তি, দান পুন্যে তাঁর সুখ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর প্রজা বাৎসল্যে, মধুর ব্যবহারে ও স্তায় বিচারে প্রজাগণ অতি আনন্দিত।

শ্রীজগন্নাথ মন্দির পুনরায় নির্মিত হয়ে জানাল জগতের মুক্তিকামী ভক্তদের শুভ আহ্বান।

কিন্তু অল্পকালের মধ্যে মন্দির আবার ভেঙ্গে পড়ল। রাজা দুর্বাক অন্তরে চিন্তা করতে লাগলেন। পাত্রমিত্রদের ডেকে জানালেন নীলাচল হতে দূরে সোনপুরে তিনি মন্দির নির্মাণ করবেন। কেননা সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় ও ঝড় ঝঞ্ঝাপাতে মন্দির সমুদ্রতীরে স্থায়ী হবে না।

রাজার কথায় সকলে দুঃখিত হলেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মন্দির নীলাচলে নির্মাণ করে ছিলেন। এখন এই মন্দির স্থানান্তরিত হলে রাজ্যের অমঙ্গল হবে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। কিন্তু রাজার ইচ্ছার উপর কেহ কিছু বলতে পারল না। মন্দির সোনপুরে প্রতিষ্ঠিত হল। অন্তর্যামী শ্রীহরি মনে মনে হাসলেন। দুঃখে ক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ল সমস্ত বিশ্ববাসী।

দেবতা নাহিক দেখি নীলাচল পরে।
ওঠে নানা কলরোল বিশ্বচরাচরে॥
নৃপতির দোষে সবে না করি বিচার।
প্রকৃতির পরিহাস নাহি প্রতিকার॥
দুঃখিত হইল সবে বিষাদ বদন।
না দেখি নীলাদ্রিপতি দেবকি নন্দন॥

এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। পরে ঐ বংশভূত রাজা কেশরী উড্র [উড়িষ্যা] দেশের সিংহাসনে বসলেন। তিনি পরম ধার্মিক সদাচারী ও বিচক্ষণ। তিনি স্থির করলেন জগন্নাথ মন্দির

সোনপুর হতে নীলাচলে নিয়ে আসবেন। রাজ্যমধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। রাজা নতুন করে নতুন রূপে মন্দির নির্মাণ করলেন নীলাচলে। শ্রীভগবানের ইচ্ছা আবার বাস্তবে রূপায়িত হল। সারা জগত নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করে পরম প্রীতিলাভ করল।

সর্ব্বচিন্তা করি রাজা করিল সে স্থির।
মন্দির নির্ম্মিত হবে নীলাচল শির॥
অপরূপ শ্রীমন্দির চক্রসহ তার।
নির্মাণ করিল রাজা রথের আকার॥
সোনপুর হতে দেব এল নীলাচলে।
অপার আনন্দে মগ্ন হইল সকলে॥

শত বৎসর মধ্যে আবার মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। লীলাময়ের বিচিত্র লীলা।

উড়িষ্যার সিংহাসনে তখন অধিষ্ঠিত আছেন শক্তিমান রাজসিক জটাজুটধারী মহাক্রোধী রাজা সিদ্ধ কিশোরী। তিনি রাজ্যের জ্ঞানীগুনীজন নিয়ে এক সভার আয়োজন করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন মন্দির নীলাচল হতে স্থানান্তরিত করা হবে। অতএব মন্দিরের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার জন্য ঐ গুনী জ্ঞানীদের মধ্য হতে এক নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করলেন। তাদের বললেন যে একমাসের মধ্যে মন্দিরের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে তারা যেন তাকে অবহিত করেন।

রাজধানী গড়মধুপুর সর্ব্বদিক হতে উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত হল। রাজা মহা উৎসাহের সঙ্গে শ্রীভগবানের এক বিচিত্র মন্দির নির্মাণ করলেন। কিন্তু মন্দিরে জগন্নাথ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে রাধাবিনোদ মূর্ত্তি স্থাপন করলেন।

দেবতা ছাড়িয়া গেল নীলাচল ঘর।
পূজিত হইবে সেই মধুপুর গড়॥

দেব দর্শনে বহু নরনারী দেশবিদেশ থেকে ছুটে এল। কিন্তু সকলে গভীর হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। তারা তাদের হৃদয়ের একমাত্র কাম্য জগন্নাথ মূর্তি দেখতে পেলনা। সেখানে বিরাজ করছেন রাধাবিনোদ মূর্তি। তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাজার অপযশ। রাজ্য মধ্যে আবার অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। এর উপর হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটল। একদিন রাজা পিতৃশ্রাদ্ধে আসনে বসেছেন। পুরোহিতের আস্‌তে কিছু বিলম্ব হয়েছে। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা। রাজা শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য যে ভূমি দান করবেন বলে স্থির করেছিলেন তা ঐ পুরোহিতকে না দিয়ে এক যবনকে দান করলেন। আর পুরোহিত বসুরথকে নানাভাবে অপমান করে রাজ্য হতে নির্বাসিত করলেন।

পুরোহিত বসুরথ মনদুঃখে রাজ্য ছেড়ে বনে গমন করলেন। গভীর অরণ্যে তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় রত হলেন। ব্রাহ্মণের কঠোর তপস্যায় মহেশ্বরের করুণা হল। তিনি ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ব্রাহ্মণ তুমি কিসের জন্য এই কঠোর তপস্যা করছ? তুমি কি চাও?"

ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে বললেন, 'হে দেবাদিদেব, তুমি ত অন্তর্যামী। আমার অন্তরের ব্যথা মুখে প্রকাশ করতে পারছি না। মহাক্রোধি রাজা সিদ্ধকেশরী আমার প্রতি দারুণ অবিচার করে আমাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেছে। আমি চাই তার প্রতিকার। ভবিষ্যতে গড়মধুপুর বাসীদের তার অন্যায় অত্যাচারের হাত হতে রক্ষা করতে।" ব্রাহ্মণের কথা শুনে শিব বললেন, "তুমি সোজা দক্ষিণ কটকে চলে যাও। পথে দেখবে, একদল বালক মাঠে খেলা করছে। সে এক বিচিত্র খেলা। 'রাজা রাজা' খেলা. তাদের দলপতিকে নিয়ে তুমি গড়মধুপুর

ফিরে যাবে। সেই বালকই হবে রাজা সিদ্ধকেশরীর একমাত্র অরি। সেই করবে তোমার অভীষ্ট পূরণ।"

ব্রাহ্মণ শিব বরে আনন্দিত হয়ে কটকের পথে চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাবার পর দেখলেন একদল বালক মাঠে 'রাজা রাজা' খেলা করছে। যে ছেলেটি রাজা সেজেছে তার সুতীক্ষ্ণ বিচার ক্ষমতা দেখে ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হলেন। মনে মনে ভাবলেন এই বালকটিই তার বাসনা পূরণ করতে সক্ষম। বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ তার মায়ের নিকট গেলেন। তাকে জানালেন যে তার ছেলে শিবের বরে রাজা হবে। গড়মধুপুর রাজা সিদ্ধকেশরীকে পরাস্ত করে সিংহাসন অধিকার করবে। ব্রাহ্মণের কথায় বালকটির মা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, "তা কি করে সম্ভব। আমার ছেলে বালকমাত্র। তার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে মহারাজ সিদ্ধকেশরীকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করা?"

ব্রাহ্মণ বললেন, "মা, দেব বরে সবই সম্ভব। তুমি লোকজন দিয়ে বালককে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

সবই দৈব ইচ্ছা। ব্রাহ্মণ বহু লোকজন সহ বালককে সঙ্গে নিয়ে গড়মধুপুরে ফিরে এলেন। রাজ্যের প্রজারা এই ব্রাহ্মণের উপর রাজার অন্যায় ও অবিচারের জন্য তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলো। তারা ব্রাহ্মণকে সর্বান্তকরণে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। কিছুদিনের মধ্যে রাজা সিদ্ধকেশরী ঐ বালকের নিকট পরাজিত ও নিহত হলেন।

এ বালক আর কেউ নয় স্বয়ং চোলবংশ ভূত রাজ চক্রবর্ত্তী চোরঙ্গদেব। তিনি পুনরায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করলেন নীলাচলে। আবার চারিদিকে মহাআনন্দের রোল উঠল। নীলাচলে ফিরে এল নীলাচলপতি। এরপর বহুকাল কেটে গেল।

দেববংশভূত ভূপাল শ্রীরাজদেব শ্রীমন্দিরের বহু সংস্কার

করে নূতন ভাবে রূপান্বিত করলেন। কিন্তু মন্দির কালের হাত হতে রক্ষা পেল না। পুনরায় ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

পিতার দেহ অবসানের পর রাজদেবের পুত্র অনঙ্গ ভীমদেব সিংহাসনে আরোহন করলেন।

তিনি অন্তরে চিন্তা করেন কি কারণে শ্রীমন্দির বারবার ভেঙ্গে পড়ে? রাজ্যের প্রবীণদের জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মন্দির সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পান না। সমস্যার সমাধান করলেন শ্রীভগবান স্বয়ং।

মহারাজ স্বপ্ন দেখছেন চক্রধারী নারায়ণ তাকে বলছেন, "হে রাজন! তুমি সমুদ্র হতে এক যোজন দূরে উত্তরদিকে মন্দির নির্মাণ কর। শত হস্ত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত কর ও চতুর্দিকে চারটি দ্বার নির্মাণ কর। কালের হাত হতে মন্দির রক্ষা করার এই একমাত্র উপায়।"

মহারাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন প্রাতে তিনি মহা উৎসাহে মন্দির পুনর্নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করলেন। বহু শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠল এক বিচিত্র মন্দির মন্দিরের অন্তর বাহির শোভিত হল নানা দেবমূর্ত্তির চিত্রে মূল মন্দিরের চারি-দিকে নির্মাণ করা হল বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির। এ মন্দির আজও অক্ষয় অবস্থায় নীলাচলে চক্রশোভিত উচ্চশিরে বিরাজ-মান।

কত বংশ কত রাজা ভবে এল গেল।
সকলে সেবিয়া সেই চরণকমল॥
গুপ্ত গৌড় গঙ্গবংশ কত মহীপাল।
চোল যদু চন্দ্রবংশ কেশরী বিশাল॥
রাখিয়া দেবের পদে ভক্তি নমস্কার।
পূজিল মন্দির করি পূর্ণ সংস্কার
স্মরণাতীত কালহতে মানবমনে দোলা দেয় সেই লীলাময়ের

লীলা মাধুর্য্যের অপূর্ব প্রতীক। কৃষ্ণ কলেবর শ্রীজগন্নাথ শ্রীহরির মৌনরূপে নীলাচল শীর্ষে অবস্থিতি জীবের অন্তরে জাগায় পুলক বিস্ময়. মহিমার অমিয় ধারায় তিরপিত করে মানবের বেদনা বিধুর মর্মস্থল বিনাশ করে আসুরিক শক্তির মহাসন্ত্রাস ॥

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

(বার)

নব অরুণিমার রক্তিম আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ব দিগন্ত। মন্দির অভ্যন্তরে ধ্বনিত হয় কাঁসর ঘন্টার সুমধুর ব্যঞ্জনা। সুললিত ভৈরব রাগের মুর্ছনায় মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস। শ্রীভগবানের প্রভাতি মঙ্গল আরতির মাধুর্য্য মণ্ডিত দীপালোকে এক রমণীয় সুষমায় রাঙিয়ে দেয় মনিকোঠার মণিময় অঙ্গনতল। সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় "জাগো জাগো" 'জাগো ভগবান "

সূচনা হয় মঙ্গল আরতির প্রভাত বন্দনা। নাট মন্দির ভরে ওঠে অগণিত দার্শনাকাঙ্খির আগমনে। দূর দূরান্তর ও দেশ দেশান্তর হতে ছুটে আসে ভক্তের দল শ্রীজগন্নাথের দর্শন মানসে। জীবনের নানা বাসনা কামনা নিয়ে তারা আসে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ কলেবর দারুব্রহ্ম সনাতনের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ হয় তাদের অন্তর বাসনা। সিদ্ধ হয় মনস্কামনা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দিন এগিয়ে চলে। এবার আরম্ভ হয় শ্রীহরির 'বালভোগের' আয়োজন। বেলা নটার মধ্যে ক্ষীর, ননী, মাখন, লাড়ু, মুরকী, ইত্যাদি সহযোগে 'বালভোগ' সমাধা হয়।

বেলা ১০ টার পর আরম্ভ হয় মণিকোঠা দর্শন। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'স্নানমেলা'।

মালা দর্শনে এসেছে সে নাট মন্দিরে গভুরস্তম্ভের এক পাশে নিঃশব্দে দাড়িয়ে অনিমেষ নয়নে শ্রীভগবানের দিকে তাকিয়ে আছে। মালা এক সম্ভ্রান্ত শবর শ্রীরঘুনাথ মৌলির একমাত্র কন্যা। তার বাড়ী নীলাচল হতে বেশ দূরে এক শবর পল্লীতে। প্রতিদিন সে এই সময় দর্শনে আসে, আজও এসেছে। কিন্তু আজ যেন সে একটু বেশী গম্ভীর ধীর ও স্থির চিত্ত মণিকোঠা দর্শন আরম্ভ হয়ে গেল। অগণিত লোক শ্রীভগবানের দর্শন মানসে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পাণ্ডাদের নানা সাবধান বাণীর সুউচ্চ রব মন্দির প্রাঙ্গনের নীরবতা ভঙ্গ করে প্রতিধ্বনিত হয়ে স্তব্ধ পরিবেশকে আলোড়িত করছে। সকলের দৃষ্টি একভাবে কেন্দ্রীভূত রত্নাসনে উপবিষ্ট শ্রীজগন্নাথের শ্রীচন্দ্রবদনের উপর। ভক্ত কণ্ঠে একস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠ্‌ল "জগন্নাথ স্বামী কি জয়।"

মালা একটু চমকে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে চল্‌ল। ধীরে ধীরে নাটমন্দির পার হয়ে জগমোহনে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পর আবার এগিয়ে চল্‌তে লাগল 'মাণকোঠার' দিকে।

মালার নয়ন হতে ঝড়ে পড়ছে অবিরল অশ্রুধারা। রত্নবেদী স্পর্শের আকাঙ্খা তাকে উদ্বেল করেছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় রত্নবেদীর কাছে। তারপর রত্নবেদীতে মাথা রেখে ভেঙ্গে পড়ল হৃদয় ভেদী কান্নায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে, "নারায়ণ আমার কামনা কি পূর্ণ হবে না প্রভু? আমি যে তোমায় আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি। তুমি কি গ্রহণ করবে না ঠাকুর?"

এক পাণ্ডার উচ্চকণ্ঠে চম্‌কে ওঠে মালা। "এই মেয়ে! এইভাবে দাড়িয়ে কেন? সর!"

মালা সম্বিৎ ফিরে পায়। ধীরে ধীরে রত্নসিংহাসন পরিক্রমা করে বেরিয়ে আসে মণিকোঠার ভিতর হতে। আবার ফিরে আসে তার আগের জায়গায়। চুপ করে দাড়িয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পর স্নানমেলা অর্থাৎ দর্শন শেষ হয়ে যায়। দর্শনার্থীর ভীড় কমে আসে নাটমন্দিরের কলকোলাহল স্তিমিত হয়ে যায়। মালা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজভোগের আয়োজন চলতে থাকে। সে এক বিরাট ব্যাপার। অগণিত ভোগ বাহকের চীৎকার (হাঁ) সকলকে সজাগ করে দেয় শ্রীভগবানের ভোগবাহকদের পথ ছেড়ে দেবার জন্য। সম্পূর্ণ রাজকীয় মর্য্যাদায় রান্নাশালে রান্না হতে থাকে। শত শত সুপকার এই-

কাজে ব্যস্ত। রাজভোগে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, ডাল, খিচুড়ি, পরমান্ন, ঘৃতান্ন হতে সুরু করে খাজা, গজা, মালপোয়া, পুরী, লাড়ু, পিঠাপুলি, কণিকা, দধী, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি রাজনিদৃষ্ট নিত্য-ভোগ এর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। নির্দিষ্ট অর্থাৎ ঠিক মধ্যাহ্নে এই ভোগ নিবেদিত হয়। এই সময়ে "দেবদাসী"দের নৃত্য হয়। নাটমন্দির মুখর হয়ে ওঠে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ব্যঞ্জনায়।

মালা অপলক নয়নে শ্রীভগবানের এই ভোগপর্ব লক্ষ্য করে কিভাবে যে সময় কেটে যায় মালা জানতে পারে না। এইভাবে রাজভোগ শেষ হলে ছত্রভোগের আয়োজন আরম্ভ হয়। শ্রীক্ষেত্রের যত মঠ, মন্দির, আশ্রম আছে তাদের উৎসর্গীকৃত এই ভোগ নিবেদন শেষ হলে প্রসাদ চলে যায় নির্দিষ্ঠ মঠ, মন্দির ও আশ্রমে।

বহুক্ষণ ধরে মালাকে লক্ষ্য করছে একজন। সে হল শ্রীভগবানের মূলসেবক বৃদ্ধ মধুসূদন মহাপাত্র। ছত্রভোগের শেষে সে মালার দিকে এগিয়ে আসে। মালাকে উদ্দেশ্য করে সে বলে, "কি মা? তুমি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? তোমার বাড়ী কোথা? বাবার নাম কি?"

মালার মুখ দিয়ে কোনও কথা ফোটে না। সে চেয়ে থাকে মধুসূদনের মুখের দিকে। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করে, "চুপ করে আছ কেন মা? চল, কিছু প্রসাদ মুখে দেবে।"

মধুসূদন মালার হাত ধরে তাকে "আনন্দবাজারে" নিয়ে আসে। মালা নিঃশব্দে মধুসূদনের অনুসরণ করে। মধুসূদন মালাকে প্রসাদ দেয় মালা শ্রদ্ধা সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করে।

এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে। রঘুনাথ উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে। মালা এখনও বাড়ী ফিরল না কেন? কোথায় গেল

মেয়েটা? রঘুনাথ মালার উদ্দেশ্যে মন্দিরের পথে বেরিয়ে পড়ে। লক্ষ্য রাখে পথের দুধারে। কিন্তু মালাকে কোথাও দেখা যায় না। শেষে রঘুনাথ মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দিরের চারিদিকে মালার অন্বেষণ করে। মালা কোথাও নাই। নাটমন্দিরে মালার খোঁজ করে। মন্দির অভ্যন্তর তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও মালার দেখা পাওয়া যায় না।

শেষে "আনন্দবাজারের" দিকে সে এগিয়ে চলে। "আনন্দবাজারে" দেখতে পায় মালা প্রসাদ গ্রহণ করছে। সামনে দাঁড়িয়ে মধুসূদন পাণ্ডা। রঘুনাথ মালার নিকট এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে সে এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ছিল মালা উত্তর দেয় সে মন্দিরে এসেছে জগন্নাথ দর্শনে। মধুসূদন রঘুনাথকে বলে, "রঘু, মালা তোমার মেয়ে তা আমি জানতাম না। পরে পরিচয় পেলাম। যাই হোক তুমি সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এস। তোমার সঙ্গে কথা আছে"। রঘু সম্মতি জানিয়ে মালাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

মন্দিরে তখনও মধ্যাহ্ন ভোগ শুরু হয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোগও যথারীতি অন্নব্যঞ্জন খাজা, গজা, পুরী, লাড়ু, মালপোয়া, ক্ষীর, দধী, প্রভৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই ভোগের প্রসাদ সাধারণের জন্য বিক্রয় হয়। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী এই প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যাভোগের আয়োজন চলতে থাকে। বহু কণ্ঠের সাবধান ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গন সোচ্চার হয়ে ওঠে সন্ধার সন্ধ্যাভোগের শেষে শ্রীভগবানের সন্ধ্যারতি একটি বিশেষ অঙ্গ। হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়। জগন্নাথের জয়ধ্বনিতে নাটমন্দির মুখর হয়ে ওঠে। গড়ুরস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ভক্তগণের শত শত আরতি দীপালোকে নাটমন্দির উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মণিকোঠার অন্তঃদীপালোক ও নাটমন্দিরের

বহিঃদীপালোক মিশ্রিত হয়ে এক মহিমময় স্বর্গীয় সুষমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে মন্দিরঙ্গন।

রাত্রি বেড়ে চলে। মধ্যরাত্রিতে শ্রীহরির শৃঙ্গার বেশ হয়। এ এক অপরূপ সাজ। শ্রীঅঙ্গের গাত্রালঙ্কার উন্মোচিত করে সুন্দর রেশম বস্ত্রে ভগবানের অঙ্গ সজ্জা করা হয়। রত্ন সিংহাসন তলে রৌপ্য নির্মিত তিনখানি পালঙ্ক রঙিন সূচিশিল্প খচিত মখ্‌মল বস্ত্রে পরিপাটি করে শয্যা রচনা করা হয়। অগরু, চন্দন, পান ও ডাবের জল থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয় ভগবানের নিশিভোগের জন্য তারপর হয় শয়নারতি এক অপূর্ব অভিনব রূপ মাধুর্য্যের পট ভূমিকায় এই আরতি আরম্ভ হয়। আরতি দীপের উজ্জ্বল আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে মণিকোঠা। বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝংকারে! শ্রীভগবানের জয়গানে ও নানাভাষার সুললিত গীত মূর্চ্ছনায় তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে নাট মন্দিরের সমস্ত পরিবেশ। তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় মণিকোঠার উন্মুক্ত দ্বার।

রাত্রে রঘুনাথ সাক্ষাৎ করতে আসে পাণ্ডা মধুসূদনের সাথে। মধুসূদন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে "আনন্দ-বাজারের" উত্তরপূর্ব কোণে নির্জনে "স্নানবেদীর চত্বরে"। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করে "রঘু তোমার মেয়ের মনে ও ব্যবহারে কোনোও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছ কি?"

রঘুনাথ বলে, "না সেরকম কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন আমার চোখে পড়ে নি, তবে সে সব সময় নির্জনে বসে কি ভাবে।' মধুসূদন বলে আমি তাকে লক্ষ্য করেছি। আমি তাকে আজ জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে সে তার কায়মন প্রাণ সমর্পণ করেছে শ্রীজগন্নাথের পদে। সে মন্দিরে দেবদাসী হতে চায়।"

রঘুনাথ চমকে ওঠে। বলে, বল কি ঠাকুর? আমার

একমাত্র মেয়ে—তাকে ছেড়ে আমি কি করে বাঁচবো ? চোখ দিয়ে তার অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মধুসূদন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "তোমার অপার সৌভাগ্য যে তোমার মেয়ে শ্রীভগবানের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছে। জগতে সবই মিথ্যা। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা সবাই পর। কেউ আপন নয়।

রঘুনাথ কিছুই ভাবতে পারে না। তার অন্তর কন্যাস্নেহে এমনই আপ্লুত যে সে মালাকে ছেড়ে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে মধুসূদনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সবই সেই লীলাময়ের ইচ্ছা। মধুসূদনের কথায় রঘুনাথের অন্তর বিচলিত হয়ে ওঠে। সে নিঃশব্দে উঠে আসে মন্দির চত্বর থেকে। মনে মনে ভাবে তবে কি সত্যই মালা জগন্নাথের পদে সমর্পিত হয়ে আছে ? এই কি বিধি নির্দেশ ? ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। আঙ্গিনার মাঝেই মালার সাথে দেখা হয়ে যায়। মালা পিতাকে দেখে চমকে ওঠে। ছুটে যায় পিতার নিকট। ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "কি হয়েছে বাবা ? তোমায় এরকম দেখাচ্ছে কেন ? শরীর কি ভাল নেই ?

রঘুনাথ বলে, "না, মা, শরীর আমার ভালই আছে।" মালার বিশ্বাস হয় না। উৎকণ্ঠিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, "সত্য বল বাবা কি হয়েছে তোমার ?"

রঘুনাথ মালার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে বুক চিড়ে বেরিয়ে আসে এক মর্মন্তুদ দীর্ঘনিঃশ্বাস। তারপর ভেঙ্গে পড়ে অবিশ্রান্ত অশ্রুবন্যায়। করুণকণ্ঠে ভেসে ওঠে তার অন্তরের একমাত্র জিজ্ঞাসা, "মালা সত্যই কি তুই শ্রীভগবানের চরণে সমর্পিতা ?"

মালা মনে মনে বুঝতে পারে, আজ আর কিছু গোপন করা যাবেনা। হ্যাঁ আজ সে কোনও লৌকিক বাধা মানবে না। পিতাকে একটি একটি করে বলবে বহুদিন পূর্ব হতে তার অন্তরের অন্তস্থলে যে দেববাঞ্ছিত বাসনার উৎস ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়ে তার দেহ ও মনকে প্লাবিত করেছে বিধৌত করেছে তার পার্থিব মোহ লালসার মলিনতা, যে ভক্তিপুষ্প অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়েছে দারুব্রহ্ম সনাতনের শ্রীপাদপদ্মে তা আজ সে প্রস্ফুটিত করবে সবার মাঝে। অতিধীরস্বরে মালা বলে, "বাবা আমি মনে মনে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি শ্রীহরির চরণ কমলে। আমাকে অনুমতি দাও বাবা আমি যেন আজীবন দেবদাসী রূপে সেই পরম করুণাময় দেব দামোদর শ্রীজগন্নাথের সেবা করতে পারি।"

রঘুনাথের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে অবিরল অশ্রুধারা মুখে শুধু কিছু বলতে পারছে না। কি বলবে সে? বলার কি আছে তার? যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদিত হয়ে আছে সে ফুল পার্থিব কামনা জড়িত কোনও দেবপূজা হবে না। সে আত্মস্থ হয়। তবে তাই হোক, হে পতিতপাবন! হে কমললোচন। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। শবর কুলের উপর তোমার অবিশ্রান্ত করুণাশীষ বর্ষিত হোক যুগে যুগে। জগতের মাঝে সেই মহাপ্রাণ বিশ্ববসুর বংশ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক আমি কায় মন প্রাণে তোমার চরণে প্রার্থনা জানাই তোমার কল্যাণময় স্পর্শে মালার জীবন ভরে উঠুক অমৃতময় মহিমায় দ্যুতিতে। মালার আত্মনিবেদন সার্থক হয়ে উঠুক।

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ"।

তের

সৃষ্টির আদি পর্ব হতে দান পুণ্যে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত ভারতের আর্যভূমি জগতের মহাতীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। শ্রীভগবান কর্তৃক মধুকৈটভের বিনাশনের সঙ্গে সঙ্গে দানবীয় অত্যাচার ও মর্মন্তুদ পাশবিক শক্তির কবল হতে আর্য্যমানবের পরিত্রাণ ও জাগতিক জীবনের কল্যাণময় পদযাত্রায় যে মহামুক্তি স্নানের শুভ সূচনা হয় তাহাই কাল হতে কালান্তরে তীর্থ স্নানে পরিণত হল। আর সেই সঙ্গে পরম করুণাময় শ্রীহরির লীলাময় অবতরণ পর্ব যুগে যুগে মুক্তির পথ আলোকিত করে আহ্বান করল লক্ষ কোটি মানুষকে তার লীলাভূমি মহাতীর্থে। সার্থকরূপে রূপায়িত হল ভগবত্‌বাণী "আত্রেন মানুষিং তনুমাশ্রিত তম্"

দ্বাপরে যে লীলা মথুরা বৃন্দাবন হতে শুরু করে সুদূর দ্বারকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল সে লীলার অবসান হল পুণ্য তীর্থ প্রভাসে। আর তাঁর দেহাবশেষ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল কলির 'দর্শনে মুক্তির।' প্রতীক দারুব্রহ্ম সনাতন শ্রীজগন্নাথ নীলাচলে। রূপায়িত হল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মহোদধী কূলে। ধন্য হল মুক্তি কামী তপস্বি আর্ত্ত ও ভক্ত। মুখরিত হল আকাশ বাতাস শ্রীভগবানের জয় গানে। উৎসবের আনন্দ কলতানে নেচে উঠল সমগ্র নীলাচল। 'বার মাসে তের পার্বণে' লীলায়িত হয়ে উঠল শ্রীমন্দিরের অঙ্গনতল।

১। চন্দনযাত্রা— বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার মহালগ্নে আরম্ভ হল শ্রীহরির একুশদিনব্যাপী চন্দনযাত্রা। অপরাহ্নে মদন মোহন মন্দির হতে যাত্রা করেন তাঁর সান্ধ্য নৌকা বিলাসে 'বিন্দু সরোবরে।' পথের দুই পার্শ্বে আকুল নয়নে অপেক্ষা করে আছে অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল ভোগনিবেদনের জন্য। মন্দির হতে বিন্দু সরোবর পর্য্যন্ত সমস্ত যাত্রাপথে ভোগ

নিবেদিত হবে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে। বিচিত্র আলোক মালায় সুশোভিত হবে বিন্দু সরোবরের চতুর্পার্শ্ব। বালকেরা করবে জল ক্রীড়া। মধ্য রাত্র পর্য্যন্ত চলবে ভোগপূজা। সরোবরের চতুর্দিক ভরে উঠবে লক্ষ লক্ষ পুন্যার্থীর ভীড়ে। ময়ূরপঙ্খী নৌকায় আরোহণ করে ঠাকুর জল বিহার করবেন। এই ভাবে একুশ দিন চলবে চন্দন যাত্রার মেলা।

আর এই অক্ষয় তৃতীয়াবই এক শুভক্ষণে আরম্ভ হবে শ্রীজগন্নাথের রথ নির্মাণ কার্য্য পুরীর রাজ অট্টালিকার সম্মুখে। নির্মাণ কার্য্য চলবে আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়া পর্যন্ত।

২। স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠ পুর্ণিমার মধ্যাহ্নের এক শুভলগ্নে শ্রীজগন্নাথের স্নান এক অপূর্ব দৃশ্য। শত শত স্নানার্থীর উপস্থিতিতে এই মহা স্নান পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে মহা সমারোহে কাঁসর ঘন্টা ও মৃদঙ্গের সুমধুর বাদ্যধ্বণিতে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শন এই চারিটি মূর্তিকে রত্নসিংহাসন হতে নামিয়ে 'আনন্দ বাজারের উত্তর পূর্ব কোণে' স্নান বেদীতে নিয়ে আসা হয়। একে 'পহণ্ডি" বলে। তারপর নিদৃষ্ট এক একটি বৃহৎ দারুখণ্ডের ওপর স্থাপিত করা হয়। এই 'পহণ্ডি' যাত্রায় চার পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে মধ্যাহ্নে নিদৃষ্ট সেবাইত দ্বারা একশত আটটি তাম্র কলসে "পাতাল গঙ্গার" (উত্তর দ্বারে শীতলা মন্দিরের নিকট একটি কূপ) পবিত্র বাড়িতে দারুমূর্তিগুলিকে স্নান করান হয়। সুললিতপুত বেদ মন্ত্রধ্বনিতে স্নাণবেদী প্রাঙ্গন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে।

তারপর আরম্ভ হয় রাজকীয় ভোগ নিবেদন। অসংখ্য মৃৎ পাত্রে (আটিকা) পূর্ণ অন্ন, ডাল, ব্যাঞ্জন সহ খাজাগজা, পুরী, লাড্ডু, পিঠাপুলি, মালপোয়া, ক্ষীর, দধী, পরমান্ন হল এই ভোগের প্রধান অঙ্গ। এই স্নান ভোগের বিশেষত্ব হল স্নান

বেদীর উন্মুক্ত অঙ্গনে হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শকের সম্মুখে ইহা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। ভোগশেষে মূর্ত্তি-গুলিকে পুনরায় মণিকোঠায় নিয়ে আসা হয় ও রত্ন বেদীর নীচে শয়ন করিয়ে রাখা হয় এবং মণিকোঠার দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন থেকে পনের দিন ঠাকুর অসুস্থ থাকেন। নানাবিধ বটিকা ও পাঁচনাদি ভোগ দেওয়া হয়। এই এক পক্ষ কাল সময়কে বলা হয় 'অনবসর'। রথের পূর্বদিন অর্থাৎ প্রতিপদের দিন জগন্নাথের 'নবজীবন' বেশ হয় ও সর্ব-সাধারণের দর্শন হয়। এই দিন লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়।

৩। রথযাত্রা—আষাঢ়ের শুক্লা-দ্বিতীয়ার শুভলগ্নে উষাকালে দারুমূর্ত্তিগুলিকে রত্নবেদী হতে নামিয়ে আবার 'পহণ্ডি' করে। প্রথমে সুদর্শন তারপর একে একে সুভদ্রা, বলরাম ও জগন্নাথকে সিংহদ্বারে নিয়ে এসে রথের ওপর স্থাপন করা হয়। এই রথযাত্রা শ্রীজগন্নাথের সবপর্ব হতে বড় পর্ব বা মহাপর্ব।

রথযাত্রা, গুণ্ডিচা যাত্রা, বাহার যাত্রা, পতিত পাবণ যাত্রা প্রভৃতি নামে অভিহিত এই মহাপর্ব শ্রীজগন্নাথদেবের অপার মহিমার এক যুগান্তকারী দিগদর্শন। আর্ত্ত, দলিত ও পতিত মানবের মুক্তি পথের আলোক বর্ত্তিকা। দেশ দেশান্তর, গিরি প্রান্তর হতে ছুটে আসে সাধু সন্ত, যোগীতপী, জ্ঞানী মুমুক্ষ। বাউল ও দাসী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানুষ সমবেত হয় শ্রীমন্দিরের সম্মুখে ও ভগবানের যাত্রাপথের উভয় পার্শ্বে। প্রপঞ্চময় পৃথিবীর জ্বালাময় বন্ধন হতে অক্ষয় মুক্তির আশায়। "রথে চ বামনং দৃষ্টা পুর্ণজন্ম ন বিদ্যতে।" এই শাশ্বত বাণী সার্থক হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ তৃষিত মানুষ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে জগন্নাথদেবের বহির্যাত্রা দর্শনের আকাঙ্খায়। সারা বছর ধরে এই দিনটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে সমাজের

অবহেলিত, নিপীড়িত জনমানুষ শ্রীভগবানকে স্পর্শ করার জন্য, আলিঙ্গন করার জন্য। কেননা এই দিনেই জগন্নাথ সবার মাঝে নিজেকে প্রকটিত করেন। কোন ভেদাভেদ থাকেনা উচ্চনীচ, গুণীজ্ঞানী, ধনীমানির মধ্যে। সব একাকার হয়ে যায়। রচিত হয় এক মহামানবের মিলনের অখণ্ড সেতু। অপার্থিব প্রেমের উৎস ভুলিয়ে দেয় সমস্ত জাগতিক প্রতিবন্ধকতা। পরমাত্ম ও জীবাত্মার মহামিলন লগ্নে মানব হৃদয়ে অনুভূত হয় সেই পরমপুরুষাকারের অমৃতময় কৃপাপরশ। ধন্য হয় মানব জীবন।

শ্রীজগন্নাথের রথে আরোহনের পর শ্রীক্ষেত্রের গজপতি মহান মহারাজাধিরাজ তাঁর নির্দ্দিষ্ট সেবা কর্ম আরম্ভ করেন। চন্দন, কুঙ্কুম, আগুরু আদি সিঞ্চন করেন ও স্বর্ণময় সম্মার্জ্জনীর দ্বারা মার্জন করেন জগন্নাথ আসনের চত্বর। তারপর তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে আরতি অর্ঘ্য নিবেদন করেন। রাজকীয় ক্রিয়াকর্ম শেষে জগন্নাথ যাত্রা করেন গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে জগন্নাথ বাস করেন আট দিন। ভোগরাগাদি সমস্ত ক্রিয়া কর্মই যথাবিধি এই মন্দিরেই সমাধি হয়। মূল মন্দির এই আট দিন শূন্য পরে থাকে। নবমীর সন্ধ্যা-লগ্নে শ্রীভগবানের দর্শনভক্তগণের পরম কাম্য। কেননা ত্রিলোক বাঞ্ছিত এই মহালগ্নে দেবতাগণ শ্রীহরির দর্শন মানসে মর্ত্ত্যে আগমণ করেন। দশমীর দিন শ্রীজগন্নাথ পুণর্যাত্রা করেন।

৪। শ্রীহরির শয়ন একাদশী পর্ব— আষাঢ়ের শুক্লা একাদশীতে শ্রীভগবান শয়ন করেন। পার্থিব জীবের কলকাকলি নিস্তব্ধ থাকে। প্রকৃতি বর্ষণ মুখরা। নদনদী স্থাবর আনন্দ বিহ্বল্য।

৫। ঝুলনযাত্রা—শ্রাবণের শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ হয় মদন মোহনের ঝুলনযাত্রা। জগমোহনের দক্ষিণে 'ঝুলন মণ্ডপে' দোদুল্যমান ঝুলনায় মদনমোহন আরোহন করেন। এই ঝুলন

অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়। নানাবর্ণের পুষ্পডোরে পরিশোভিত হয় 'ঝুলন মণ্ডপ' এই উৎসব পর্ব চলে পূর্ণিমা পর্যান্ত। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়। রাখী বন্ধনের আনন্দে মেতে ওঠে সারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

মানবকুল একে অন্যের প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরমানন্দে মাতিয়ে তোলে সমগ্র নীলাচল।

৬। শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন—। ভাদ্রের শুক্লাদ্বোদশীতে জগন্নাথের এ উৎসবের সূচনা হয়। বিশেষ রূপে ভোগ আরতির মাধ্যমে এই বিচিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়। নাটমন্দির ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে মেতে ওঠে।

৭। প্রাবরণ ষষ্ঠি—। আশ্বিনের শুক্ল ষষ্ঠিতে বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথদেবকে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রীভগবানের ভোগ আরতি হয়। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল দর্শনার্থীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বেশী। নারীগণ নাট-মন্দিরের অঙ্গন তলে বিচিত্র অঙ্কনের ওপর প্রদীপ, আতপতণ্ডুল, ও নানাপ্রকার ফলমূলের নৈবেদ্য সাজিয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন সন্ধ্যায়। নানাপ্রকার বাদ্য ধ্বনির দ্বারা সন্ধ্যা আরতি সমাপন করা হয়।

৮। শ্রীহরির উত্থান একাদশী পর্ব—। কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশীতে এই উৎসব হয় শ্রীজগন্নাথ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রাজকীয় বেশে সজ্জিত হন। মহা জাকজমকের সঙ্গে ভোগ আরতি হয়। সারা কার্ত্তিক মাস শ্রীক্ষেত্রে এক পুন্যমাস রূপে পালিত হয়। নারীগণ প্রাতঃকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলসীমঞ্চ মাথায় করে সমুদ্রতীরে সমবেত হন। তারপর সাগরকুলে বালুর মন্দির নির্মাণ করে তার ওপর তুলসীমঞ্চ স্থাপন করে দলবদ্ধভাবে বসে পূজা করেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সমুদ্রকুল লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। পুণ্যার্থীরা এই মনোরম দৃশ্য ও ভক্তিপূর্ণ পূজা মন প্রাণভরে উপভোগ করেন। দিবাবসানে নারীগণ আবার তুলসী মঞ্চ মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে যান।

৯। মাগীপূর্ণিমা পর্ব। "মাসানাং মার্গশীর্ষোহং" শ্রীভগবানের এই বাণী সার্থক হয়ে ওঠে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায়। জগন্নাথ চতুর্ভুজরূপে অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তাঁর আপন বিভূতি যুক্ত এই শুভ মাসের শুভক্ষণে আর্ত্ত মানবকে মহামুক্তির আহ্বান জানান। অগণিত মানুষ মন্দিরে সমাবেত হয়ে শ্রীহরির এই অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করে নয়ন তৃপ্ত করেন। সফল হয় তাদের মন বাসনা। সকল অমঙ্গল, সকল জ্বালা, সকল দুস্কৃতি নাশ করে ভরিয়ে তোলে পৃথিবীর বুকে এক সুমধুর আনন্দ হিল্লোল। ভাসিয়ে নিয়ে যায় মানব হৃদয়ের অর্ঘ্য কুসুম মহাকল্যাণের অমিয় ধারায়।

১০। শ্রীহরির রাজ অভিষেক পর্ব। পৌষপূর্ণিমায় হয় শ্রীজগন্নাথের রাজঅভিষেক পর্ব। সুবর্ণের হস্ত পদাদি যুক্ত হয়ে ত্রিলোক বাঞ্ছিত মনোহর "রাজ বেশ" ধারণ। দেশ দেশান্তর হতে দর্শনার্থী ও ভক্ত ছুটে আসে পুরুষোত্তমের পুণ্য ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের রাজবেশ' দর্শন করতে। বিচিত্র বর্ণের আলোক মালায় ঝল্‌মল্‌ করে নাট মন্দির ও জগমোহন। সহস্র কণ্ঠের ভজন গানে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গন। পৌষের প্রথম দিন হতে সুরু করে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত ভগবানের একটি বিশেষ ভোগ হয়। এর নাম স্থানীয় ভাষায় "পহেলী ভোগ". সারামাস যথা বিধি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ভোগ নিবেদন করা হয়। এর অন্যথা হবার উপায় নেই। কঠোর রাজনির্দেশে এই ভোগের সমস্ত কর্ম পরম নিষ্ঠার সঙ্গেও সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

১১। গজোদ্ধারন পর্ব—। মাঘ মাসের পুর্ণিমার দিন শ্রীজগন্নাথের শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ রূপ হয়। হস্ত পদাদি সমস্ত 'শোলায়' নির্মিত। মণিমাণিক্যাদিসহ রত্নালঙ্কারে ভূষিত রঙিন পট্টবস্ত্র পরিহিত শ্রীভগবান তাঁর পরম ভক্ত গজকে বিশ্বাসঘাতক কুমীরের কবল হতে রক্ষা করেন। রত্নবেদীর সম্মুখে ভক্তগজ উর্দ্ধ মুখে পদ্মপুষ্পধৃত শুঁড় উত্তোলন করে দাঁড়িয়ে আর সুদর্শনচক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত কুমীর পরে থাকে পার্শ্বে। জগন্নাথের এই বেশের নাম "গজোদ্ধারন" বেশ। সমুদ্র তীরে যে স্থানে ভগবান ভক্ত গজকে কুমীরের কবল হতে উদ্ধার করেন সেই স্থানের নাম "চক্রতীর্থ"। ভক্ত ও পুন্যার্থীগণ আজও এখানে সংকল্প দান পুন্যাদি করেন।

১২। দোল পুর্ণিমা—ফাল্গুন পুর্ণিমায় শ্রীজগন্নাথ প্রতিনিধি মদনমোহনের হোলি উৎসব পালন করা হয়। শ্রীমন্দিরের উত্তর পার্শ্বে দোলবেদীতে মনোরম সুসজ্জিত দোলনায় মদন মোহন আরোহন করে হোলি ক্রীড়া করেন। পূর্বরাত্রে "নেড়াপোড়া" উৎসব হয়। বহু উর্দ্ধে উত্থিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখার মধ্য দিয়ে একটি মেড়া একলম্ফে অগ্নিকুণ্ড অতিক্রম করে যায়। বহু দর্শনার্থীর সমাবেশ হয় এই "মেড়াপোড়া" উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। দোলযাত্রা পুরুষোত্তমের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব। নানা দেশ হতে লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত, ভক্ত ও পুন্যার্থীর সমাগম হয়। বিশেষ করে বাঙালী মহিলা যাত্রীর ভীড় হয় বেশী

১৩। বিষ্ণু দমন চতুর্দশী – চৈত্রের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এই উৎসব হয়। এই পর্বের বিশেষত্ব হল গভীর রাত্রে "হরিহর ভেট্"। শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবিশ্বনাথ উভয়ের মহা মিলন।

লোকনাথ শিব মন্দির হতে জগন্নাথ মন্দির পর্য্যন্ত দুমাইল পথ ভক্ত ও পুন্যার্থীর সমাবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে। পথ মধ্যে

খাজা গজা লাড্ডু প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়। সকল যাত্রীই রাত্রি জাগরণ করে এজন্য এপর্বের আর এক নাম স্থানীয় ভাষায় "জাগর"। এই হল শ্রীজগন্নাথের বার মাসে তের পার্বন।

"জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্য ন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখম্॥

(চৌদ্দ)

জাগৃহি, জাগৃহি, হে ভগবান !

দারু ব্রহ্ম সনাতন, পদ্মপলাশ লোচন, জাগৃহি। "জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে"। ভোরের মঙ্গল আরতির সমাপ্তির ক্ষণিক নীরবতা ভেদ করে এক সুললিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে "জাগো ভগবান, জাগো !"

মুহুর্তের তরে চকিত করে নাটমন্দিরের সমবেত দর্শনার্থীদের। মুগ্ধ করে সকলের মনকে, আলোড়িত করে হৃদয় তন্ত্রীকে। সকলে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে গড়ুর স্তম্ভের পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক সুন্দর দিব্যকান্তি যুবকের প্রতি। সে যুক্তকরে শ্রীভগবানের চরণে আপন অন্তরের সকাতর মিনতি জ্ঞাপন করছে। তার চন্দন চর্চিত প্রশস্ত ললাট। অশ্রু বিগলিত নয়ন। উন্নত নাসিকা আজানুলম্বিত বাহু। মনে হয় দেবলোক হতে নেমে এসেছে এক অপ্সর দারুব্রহ্ম সনাতনের শ্রীচরণে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করতে। সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরে।

উদয়ন, পরম সাত্ত্বিক জগন্নাথ পাণ্ডা ত্রিলোচন পূজারীর পুত্র। সে এসেছে শ্রীভগবানের মঙ্গল আরতি দর্শন করতে। সে জগন্নাথের চরণে প্রার্থনা জানায় "হে প্রভু, করুণা সিন্ধু, তোমার লীলার অন্ত নেই, আমি তোমার মহিমময় লীলার দর্শনপ্রার্থী। দয়া করে তোমার অনন্তলীলার কিঞ্চিৎ মাত্র দেখিয়ে আমাকে চরিতার্থ কর। আমি মূঢ়। আমার এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে তোমার সেই দেববাঞ্ছিত লীলা দর্শন করতে পারি। তোমার কৃপাগুণে আমাকে কৃতার্থ কর।"

পিতার মুখে সে শ্রীভগবানের অনেক লীলা কাহিনী শুনেছে। বহু লোকের নিকটও শ্রীহরির বহু লীলা মাহাত্ম্য শুনেছে। আর সেই সব কাহিনী তার হৃদয়ে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে সে মনে মনে এক রকম স্থির করে ফেলেছে

যে, এসব কাহিনী শুধু কাহিনীই নয়, সব সত্য। তার একান্ত মন বাসনা সেই অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করা। সে জানেও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে পরম পুরুষাকার দারুব্রহ্ম সনাতন অন্তর্যামী। তিনি বাঞ্ছা কল্পতরু। কারও মনবাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই ভক্তি বিগলিত চিত্তে শ্রীভগবানের চরণে নিয়ত প্রার্থনা জানায়, "হে ঠাকুর, তুমি তোমার ভুবন মোহন লীলার সামান্য মাত্র অংশ আমার দেখার সুযোগ দাও। দয়া কর প্রভু। দীন ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

পিতার নিকট সে শুনেছে লীলাময় শ্রীজগন্নাথের কত অশ্রুতপূর্ব বিচিত্র চিত্তাকর্ষক কাহিনী।

পুরী গজপতি মহারাজের বিবাহ। কলাহাণ্ডির রাজকুমারীর সঙ্গে। বিবাহের কথাবার্তা দিনক্ষণ, সব স্থির হয়ে গেছে। এমন সময় হটাৎ এক বিঘ্ন এসে উপস্থিত হল।
কলাহাণ্ডিরাজ শুনেছেন যে পুরী মহারাজ রথের ওপর ঝাড়ু দেন রথযাত্রার দিন। অতএব এক ঝাড়ুদারের হাতে তিনি কন্যা সম্প্রদান করতে পারেন না। তিনি পরাক্রান্তশালী, স্বনামধন্য, পরম কুলীন ও সাত্বিক রাজা। তিনি কি করে একজন হীন কর্মি রাজার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন? না, না, তিনি এ বিবাহ ভেঙ্গে দেবেন। তিনি দূত মুখে খবর পাঠালেন পুরী মহারাজের নিকট। তাঁর এ বিবাহে মত নেই। একজন ঝাড়ুদারের হাতে তিনি কন্যা দেবেন না।

দূত মুখে একথা শুনে গজপতি মহারাজ মর্মাহত হলেন। শ্রীজগন্নাথকে তাঁর মনব্যথা জানালেন। "প্রভু আমি তোমার সেবক। তোমার সেবা করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। তোমার সেবক হয়ে আমি এ অপমান সহ্য করব না। আমি কলাহাণ্ডি আক্রমণ করব। তুমি আমার সহায় হও প্রভু।"

রাজা এই দুর্বিসহ অপমান হৃদয়ে চেপে রেখে সৈন্য সামন্ত

নিয়ে কলাহাণ্ডি আক্রমণ করলেন। সাতদিন প্রবল যুদ্ধের পর বহু সৈন্য ক্ষয় করে গজপতি মহারাজ কলাহাণ্ডিরাজের নিকট পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশাই নেই। তিনি শ্রীজগন্নাথের শরণ নিলেন। "তুমি যা কর প্রভু! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।"

এমন সময় কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল কেউ জানতে পারল না। হঠাৎ দুজন মহাবীর অশ্বারোহী যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে কলাহাণ্ডি মহারাজের সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে বিপর্যাস্ত করে রাজাকে বন্দি করল।

গজপতি মহারাজ এই অলৌকিক কার্য্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কি আশ্চর্য্য! কোথা হতে এই অশ্বারোহীদ্বয় আবির্ভূত হল? তাঁর পক্ষে যুদ্ধ জয় কি করে সম্ভব হল? একি সত্য না তিনি স্বপ্ন দেখছেন? হে অন্তর্য্যামী নারায়ণ, একি তোমারই লীলা? হে ভক্তবৎসল তোমার চরণে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।

গভীর নিশীথে কলাহাণ্ডি মহারাজ স্বপ্ন দেখছেন। সম্মুখে তাঁর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী স্বয়ং নারায়ণ তিনি বলছেন, "শোন রাজা, পুরী মহারাজ আমার পরম। ভক্ত ও সেবক। তাঁর কোন কর্মই হীন নয়। তুমি কুলাভিমানে গর্বিত হয়ে তাঁর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছ। তুমি তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কন্যা দান কর। তোমার মঙ্গল হবে"

সহসা রাজার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কণ্ঠে ফুটে ওঠে করুণ কাতর স্বর "ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু। আমি অহংকারে মদমত্ত হয়ে নীচ নরাধমের কাজ করেছি। আমি অন্যায়ের প্রায়োশ্চিত্ত করব। গজপতি মহারাজের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে ধন্য হব"

পরদিন মহারাজ পুরীরাজের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করলেন গজপতি মহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কন্যা সম্প্রদান করলেন তাঁর হাতে, আর তাঁর রাজ্যের এক চতুর্থাংশ পুরীরাজকে যৌতুক স্বরূপ দান করলেন।

উদয়ন শ্রীজগন্নাথের আরও অনেক মহিমময় কাহিনী শুনেছে অনেক লোকের কাছে।

এক অতি গরীব গোয়ালিনী, নাম মাধুরী দূরে এক পল্লীতে পর্ণকুটিরে বাস করে। দধী মাখন বিক্রী করে কোন রকমে তার জীবিকা নির্বাহ হয় অন্তরে তার দুঃখের লেশ মাত্র নেই। শ্রীহরির চরণে তার অচলাভক্তি। প্রতিদিন সকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও প্রণাম করে মাথায় পসরা নিয়ে রাজপথে বেড়িয়ে পরে। সেদিন একাদশী। বৈশাখের খর মধ্যাহ্নের রৌদ্র তাপে ক্লান্ত মাধুরী একটি গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছে। এমন সময় সে দেখতে পেল দুজন অশ্বারোহী সৈনিক তার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে অল্পক্ষণ মধ্যে তারা মাধুরীর নিকট এসে ঘোড়া থেকে নেমে পরল। তারা মাধূরীকে বল্‌ল, "দিদি, বড় পিপাসা পেয়েছে, দই দাও খাব।"

মাধুরী তাদের রৌদ্রতপ্ত ক্লান্ত শরীর দেখে মনে মনে দুঃখিত হল। পরে দুভাঁড় দই দুজনকে দিল সৈন্যেরা দই খেয়ে চলে যাচ্ছিল, মাধুরী মৃদুস্বরে দইয়ের মূল্যের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিল। তখন একজন সৈনা তার হাতের এক গাছা বালা খুলে মাধুরীকে দিয়ে বল্‌ল, "দিদি, আমরা কর্ম ব্যস্ত, আমাদের কাছে মূল্য দেবার মত মুদ্রা নেই। তুমি এই বালা বিক্রী করে দইয়ের মূল্য নিও।" এই বলে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। মাধুরী অবাক বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল।

মাধুরী বিকালে স্বর্ণকারের নিকট গেল বালা বিক্রী করার

জন্য। স্বর্ণকার এই মহামূল্যবান রত্ন খচিত বালা দেখে সন্দিগ্ধ হল, সে স্থানীয় কোতয়ালীতে খবর দিয়ে মাধুরীকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিল। পরে পরীক্ষা করে জানা গেল যে বালাটি জগন্নাথের। মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল "দুজন অশ্বারোহী সৈনিক আমার কাছে দই খেয়ে ঐ বালাটি দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। আমি এর বেশী কিছু জানিনা।" মাধুরীর কথা কারও বিশ্বাস হলনা, ফলে মাধুরীর কারাবাস হল।

কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝতে পারে? তিনি যে ভক্তবৎসল, করুণানিদাম। সেই রাত্রে রাজা স্বপ্নবাণী শুনলেন "রাজা, আমার পরম ভক্ত মাধুরী গোয়ালিনীকে মুক্ত দাও। বালা আমি তা'কে দিয়েছি।"

পরদিন রাজা মাধুরীকে মুক্ত করে দিলেন। মাধুরী বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু একি! তার সেই পুরাতন পর্ণ কুটির কোথা? সেখানে এক বিরাট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে। বহু দাস দাসী যাতায়াত করছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরশীরা বলল, কিছু দিন পূর্বে একজন ধনী ব্যক্তি এই বাড়ী নির্মাণ করে বলে গেছেন যে তিনি একজন মাধুরীর অতি নিকট আত্মীয়। এ বাড়ী মাধুরীর জন্য নির্মাণ করেছেন এসব শুনে মাধুরী আরও বিস্মিত হয় তা'র ত কোন ধনী আত্মীয় নেই। কে তার জন্য এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করল? এত দাস দাসীই বা কোথা হতে এল? তবে কি সবই সেই শ্রীভগবানের কৃপা? অন্তর তার কেঁদে ওঠে, "হে করুণাময়, তোমার কৃপার অন্ত নেই। আমার মত হতভাগিনীকে যে তুমি এত কৃপা করেছ তার জন্য তোমার পদে শত কোটি প্রণাম জানাই। দূর দূরান্তর হতে বহু লোক ছুটে আসে পরম ভক্ত মাধুরীকে দেখবার জন্য। এই মহা ভাগ্যবতীকে

দেখে নিজেদের ধন্য করার জন্য। শ্রীজগন্নাথের ভক্ত লীলা জগতের মাঝে প্রচারিত হয়ে আকর্ষণ করে লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত মানবকে এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে।

উদয়ন এসব আলৌকিক লীলা কাহিনী শুনে অন্তরে পুলকিত হয়ে ওঠে। শ্রীহরির পদে প্রণাম জানায়। "হে ভগবান, কৃপা করে দর্শন দাও।" শ্রীহরির দর্শন মানসে তার মন প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

সেদিন কমলা মন্দিরে বসে শুনতে পায়, কে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তদের মাঝে শ্রীভগবানের এক অপূর্ব লীলা কাহিনী সুন্দর ভাবে বর্ণনা করছেন। রথের দিন অপরাহ্নে শ্রীজগন্নাথের "পহণ্ডি" চলেছে। বহু চেষ্টা করেও পাণ্ডারা ঠাকুরকে রথে তুলতে পারছেনা। যতই তারা ঠাকুরকে রথের ওপরের দিকে আকর্ষণ করছে, জগন্নাথ ততই নীচের দিকে গড়িয়ে নেমে আসছেন। এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। তারা অনন্যোপায় হয়ে রাজার নিকট খবর পাঠায়। রাজা ঘটনাটি শুনেই মুহূর্ত্ত মাত্র অপেক্ষা না'করে ছুটে আসেন মন্দির দ্বারে। দেখেন শ্রীজগন্নাথ 'পহণ্ডির' অর্দ্ধপথে দণ্ডায়মান। সকলে হায় হায় করছে।

সাধু সন্তরা শ্রীভগবানের স্তব-স্তুতি করছেন। রথযাত্রার লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর মাঝে জগন্নাথের এক অভিনব লীলা। রাজা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান রথের দিকে। তারপর ঠাকুরকে স্পর্শ করে মিনতির স্বরে বলেন, "হে দয়িত, আর্ত্তত্রাণ করুণা-বতার। বল, বল, আমার কি অপরাধ? অধম সেবকের যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে ঠাকুর, তার শাস্তি আমাকে দাও প্রভু। আজ পুণ্য দিনে দেখ তোমার সামনে লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত ও ভক্তের দল তোমার পতিত পাবন যাত্রা দেখার আশায় পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব নয়নে চেয়ে আছে তোমার দিকে। দয়া কর

প্রভু। চল, তোমার আসনে বসবে চল।”

রাজার দুনয়নে অবিরল বারিধারা। তিনি ধীরে ধীরে ঠাকুরকে ওপরের দিকে আকর্ষণ করেন। কি আশ্চর্য শ্রীভগবানের একি লীলা! তিনি যেন আপন ইচ্ছায় রথের ওপরের দিকে উঠে চলেছেন। ফেটে পরে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের আনন্দোচ্ছ্বাসে, “জয় জগন্নাথ স্বামী কি জয়” ভেসে ওঠে সাধু কণ্ঠের মন্ত্রধ্বনির সুললিত ঝঙ্কার। “জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে।”

রাজা তাঁর নির্দ্দিষ্ট কর্ম শেষ করে নিচে নেমে আসেন। জগন্নাথের রথ “নন্দী ঘোষ” ছুটে চলে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। শ্রীভগবানের এমনই মহান লীলা।

উদয়ন শুনছে, জগন্নাথ লীলার একটির পর একটি কাহিনী। সে মনে মনে প্রার্থনা জানায়, “হে নারায়ণ দেখা দাও। আমার মনবাসনা পূর্ণ কর ঠাকুর।”

শ্রীভগবানের প্রত্যেকটি লীলাকাহিনী তার হৃদয়ে সত্যে পরিণত হয়ে তাকে ব্যাকুল করে তোলে। সে মনে মনে স্থির করে, না-আর অপেক্ষা করবেনা। আজই সে মন্দিরে রাত্রি যাপন করবে সকলের অলক্ষে।

রাত্রে জগন্নাথের শৃঙ্গার বেশ শেষ হবার পূর্বে সকলের অলক্ষে সে প্রবেশ করে মণিকোঠার মধ্যে। অপেক্ষা করে রত্নবেদীর পশ্চাতে। সাজ সজ্জা সেবা পাট শেষ করে পূজারীর দল মণিকোঠার বাইরে এসে দ্বার বন্ধ করে চলে গেলেন। প্রহরীরা মন্দির প্রাঙ্গণ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। কেউ ভিতরে আছে কিনা? যখন দেখল মন্দিরে আর কেউ নেই তখন তারা নিজ নিজ স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত হল।

এদিকে গভীর নিশীথে উদয়ন দেখে সমস্ত মণিকোঠা উজ্জল জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। একটা অপার্থিব

সৌগন্ধে মণিকোঠা মাতোয়ারা। রত্নবেদীর সম্মুখের পালঙ্কে উপবিষ্ট লক্ষ্মী নারায়ণ। লক্ষ্মী উদ্‌বিগ্ন চিত্তে নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন। "প্রভু, এখানে মানুষের গন্ধ কেন?" অন্তর্য্যামী নারায়ণ মনে মনে হাসেন। তিনি সবই জানেন তিনি যে ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তের ভক্তিডোরে তিনি যে বাঁধা। তিনি বললেন "লক্ষ্মী, আমার এক পরম ভক্ত এখানে এসেছে আমাদের দর্শন মানসে।" লক্ষ্মী বলে ওঠেন, "সে কি প্রভু! মর্ত্যের মানুষ এখানে? আশ্চর্য্য! প্রভু, তোমার লীলা বোঝা ভার।

নারায়ণ মৃদু হেসে মধুর স্বরে আহ্বান করলেন, "কে তুমি ভক্ত? আঁধারে লুকিয়ে কেন? সামনে এস"

ভীত ত্রস্ত উদয়নের হৃদয় পুলকিত হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে রত্নবেদীর পশ্চাৎ হতে বেড়িয়ে আসে নতজানু হয়ে প্রণতি জানায়। লক্ষ্মী নারায়ণের দিব্য দ্যুতিময় অপরূপ রূপলাবণ্যের মাধুরিমায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পরে।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে শ্রীভগবানের মুখের দিকে চেয়ে। মুখে কথা ফোটে না। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে ধ্বনিত হয়, "পেয়েছি, আমার এতদিনের ঈপ্সিত বস্তু জীবনের কামনা বাসনা আজ আমার পূর্ণ হল।"

আবার মধু কণ্ঠে শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করেন, "কি চাও তুমি?"

উদয়ণ নীরব "কি চাই আমি?" সে মনে মনে বলে, "তুমি কি জাননা প্রভু, আমার অন্তর বাসনা? তুমিত অন্তর্য্যামী। আমি চাই তোমার রাতুল চরণে আমার সর্বসত্ত্বা লীন হয়ে যাক

শ্রীভগবান বলেন, "কি? নীরব কেন?" উদয়নের মুখে ফুটে ওঠে। "যুগ যুগ হতে প্রভু, তুমি দিয়েছ, কত পাপী তাপী, দুষ্কৃতি, আর্ত্ত ও ভক্তকে মহামুক্তির সন্ধান। হে কৃপাময়, এই

অজ্ঞান অধর্মীকে মুক্ত কর প্রভু! আমার আজীবন বাসনা ছিল তোমার দর্শন। আজ তা আমার পূর্ণ হয়েছে। আমি এর বেশী কিছু চাইনা। আমার একমাত্র কামনা তোমার চরণে স্থান।

নারায়ণ বললেন, "তাই হবে ভক্ত। অন্তে তুমি আমার পদেই স্থান পাবে। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রেখ, আজ যা' তুমি দেখলে তা' কারও নিকট প্রকাশ করবে না। যদি প্রকাশ কর তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।"

এই কথা বলে লক্ষ্মীনারায়ণ অন্তর্ধান হলেন।

সকালে মণিকোঠার দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সেবকেরা দেখতে পেল, রত্ন বেদীর তলে শায়িত উদয়নকে। তাকে তারা চোর সাব্যস্ত করে রাজ দরবারে নিয়ে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মণিকোঠার মধ্যে প্রবেশ করেছিলে কেন? নিশ্চয়ই তোমার মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল? উত্তর দাও।" উদয়ন করুণ কণ্ঠে বলে ওঠে, "না-না-মহারাজ, আমার মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমি চোর নই।"

রাজা বললেন, "তবে কেন তুমি মণিকোঠায় প্রবেশ করে ছিলে? সত্য বল, নচেৎ তোমায় বধ করা হবে।"

উদয়ন ভাবে "মৃত্যু আমার অনিবার্য্য। তবে শ্রীজগন্নাথের লীলার কথা প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ।" সে গত রাত্রের সমস্ত কাহিনী অকপটে প্রকাশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হ'ল।

শ্রেষ্ঠ ভক্ত উদয়ন, তার জাগতিক বাসনা কামনা সার্থক করে অমৃত লোকে প্রস্থান করল।

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

(পনের)

পৃথিবীর বুকে চলেছে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য। কাল মেঘ ছুটে চলেছে আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে। বজ্রের মর্‌মর্‌ ধ্বনিতে ফেটে পরছে সমগ্র দিকদিগন্ত। ধরনীর গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে মুহুর্মুহু ফুটে উঠছে বিদ্যুৎ ঝলক। মহাসিন্ধু নেচে উঠেছে গভীর আর্ত্তনাদে। প্রবাহিত তুফান স্রোত বিস্তৃত হয়ে চলেছে পুরুষোত্তমের পথে পথে "হে দারুব্রহ্ম সনাতন। একি তোমার ভয়ঙ্কর লীলা? সম্বর, সম্বর প্রভু তোমার এই বিশ্বধ্বংসী মহালীলা।" সহস্র সহস্র ভক্ত কণ্ঠের কাতর মিনতি মুখরিত করে সমগ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। অবশেষে স্তিমিত হয়ে আসে প্রকৃতির সেই তাণ্ডব লীলা। সমুদ্রের প্রচণ্ড জলোচ্ছাসে তরঙ্গস্রোত প্রবাহ বিস্তারিত হয় কপোতেশ্বর পর্য্যন্ত। বহু জলজন্তু উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পরে নগরের পথ প্রান্তরে।

এমনই ভাবে সিন্ধুস্রোত টেনে নিয়ে যায় এক বিরাট কুমীরকে কপোতেশ্বরের এক প্রান্তরে।

প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথের এক পরমভক্ত গজ দণ্ডকারণ্য হতে যথারীতি প্রতিদিনের মত আজও চলেছে একটি পদ্মপুষ্প শুঁড়ে ধরে সমুদ্রস্নানের উদ্দেশ্যে। শ্রীপতি শরণ করে গজ আপন মনে চলেছে। মাঝপথে দেখে এক বিরাট কুমীর অদ্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ভক্তগজের করুণ হৃদয় বিগলিত হয়, আহা! জলের জীব এতদূর এসে পড়েছে গত রাত্রির তুফান স্রোতে। এভাবে পরে থাকলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য।

গজকে দেখে কুমীর ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "হে গজরাজ তুমি কোথায় চলেছ ভাই? গজ বল্‌ল, "আমি সমুদ্রে নিত্য স্নানে চলেছি।" কুমীর মিনতি ভরা কণ্ঠে বল্‌ল, "ভাই, কাল রাত্রি হতে আমি অনাহারে এভাবে পরে আছি।

যদি তুমি দয়া করে আমাকে পিঠে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দাও তবে আমার জীবন রক্ষা হয়।" কুমীরের দুঃখ দেখে গজ বলল, "চল তোমাকে আমি পিঠে নিয়ে সমুদ্রে নামিয়ে দেব আমাকে ত' সমুদ্রে যেতেই হবে।"

কুমীর অতি আনন্দিত হয়ে গজকে বল্‌ল, "তুমি আমার আজ যে উপকার করলে তা আমি জীবনে ভুলবো না। আজ থেকে তুমি আমার মিতা।"

গজ কুমীরকে পিঠে নিয়ে চলতে লাগল পথে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হল। গত রাত্রির ভীষণ ঝড় ঝঞ্ঝায় ও সমুদ্রের ভয়ঙ্কর তুফান স্রোতে কি ভাবে এখানে এসে জীবন্মৃত অবস্থায় পরেছিল তাও সবিস্তারে বর্ণনা করল। গজ কুমীরের কথা শুনে মনে মনে দুঃখিত হল। মুখে বল্‌ল, "ভগবান তোমায় রক্ষা করেছেন, তাঁর পদে সদা মতি রাখ। অন্তে তোমার মঙ্গল হবে। তিনি যে কৃপাময়, সকল জীবের কল্যাণ কামনাই তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। কুমীর বলল "তা' সত্য ভাই। তাঁর কৃপায় আজ আমার জীবন রক্ষা হল।"

এইভাবে দুইমিতার কথাবার্ত্তার মধ্যে তারা পুরুষোত্তমে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল। গজ সমুদ্র মধ্যে কিছু দূর এগিয়ে কুমীরকে জলে নামিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তখন কুমীর বলল, "এত অল্পজলে এই বিশাল শরীর নিয়ে যেতে পারব না। আমাকে একটু গভীর জলে নামিয়ে দাও।"

গজ কুমীরের কথামত তাকে স্তার আবক্ষ জলের মধ্যে নামিয়ে দিল। তখন কুমীর তার শুঁড় ধরে গভীর জল মধ্যে আকর্ষণ করতে লাগল।

গজ ভীত হয়ে বলল, "একি মিতে! তুমি আমাকে গভীর জলের মধ্যে আকর্ষণ করছ কেন? আমি স্থলের জীব জলে আমি তোমার সঙ্গে পারব কেন? আমাকে

ছেড়ে দাও।" কুমীর বলল, "তা' কি করে হয়? আমি গত কাল হতে উপবাসী। তা' ছাড়া তুমি আমার খাদ্য আর আমি তোমার খাদক। এখন আমি জঠর জ্বালায় জ্বল্‌ছি। আমার মুখের গ্রাস আমি ছাড়ব না।"

গজ তখন অনন্যোপায় হয়ে শ্রীহরির শরণ নিল। "হে দয়াময়, হে বিপদ তারণ রক্ষা কর প্রভু।"

ভক্তের আর্ত্ত প্রার্থনা ভগবানের অন্তর স্পর্শ করল তিনি তখন বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর সাথে পাশা খেলছিলেন। বারে বারে পরাজিত হচ্ছিলেন লক্ষ্মী, কিন্তু এবার তাঁর জেতবার সম্ভাবনা। আর ঠিক এই সময়ই নারায়ণ বলে উঠ্‌লেন, "ভয় নেই ভক্ত, আমি এখনই আসছি।" লক্ষ্মী তখন ভগবানের হাত ধরে বললেন, "তা হবে না প্রভু, এবার আমি জিতব। এখন ভক্তের নাম করে উঠে গেলে চলবে না। এ দান খেলে যেতে হবে।"

একদিকে ভক্তের আর্ত্ত আহ্বান অপর দিকে লক্ষ্মীর আকর্ষন। নারায়ণ তখন উভয় দিক রক্ষা করে সুদর্শনকে আহ্বান করে বললেন। "সুদর্শন, যাও তুমি পুরুষোত্তমে, সেখানে কুমীরকে বধ করে আমার পরম ভক্ত গজকে উদ্ধার কর।" সুদর্শন "যথা আজ্ঞা" বলে পুরুষোত্তম অভিমুখে ধাবিত হল। বিশ্বাসঘাতক কুমীর বধ হল ভক্ত গজ রক্ষা পেল।

এদিকে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের পাশা খেলা শেষ হয়েছে। লক্ষ্মী তখন নারায়ণকে অনুরোধ করলেন, "চল প্রভু, দেখে আসি কোথা তোমার ভক্ত গজকে কুমীর আক্রমণ করেছিল।"

লীলাময় শ্রীভগবান লক্ষ্মীর অনুরোধে গড়ুরকে আহ্বান করলেন। গড়ুর এসে প্রণতি জানাল। লক্ষ্মীনারায়ণ গড়ুরের পিঠে আরোহন করে পুরুষোত্তমে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন।

নারায়ণ বললেন, "দেখ লক্ষ্মী, ঐ সেই বিশ্বাসঘাতক কুমীর, আর ঐ দেখ ভক্ত গজ শুঁড় তুলে আমাকে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছে।"

লক্ষ্মী শ্রীভগবানের ভক্ত বাৎসল্যের মহান লীলা দেখে অতিশয় প্রীত হয়ে নারায়ণের পদে প্রণাম জানিয়ে বললেন, "ক্ষমা কর প্রভু! আমি বুঝতে পারিনি তোমার অপার করুণার এই মহৎ কর্মকাণ্ড। তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা যে তোমার আর্ত্তত্রাণ লীলার স্মারক হয়ে পুরুষোত্তমে এই স্থান "চক্রতীর্থ" নামে যুগে যুগে আর্ত্ত মানবের মুক্তির মহাতীর্থ রূপে প্রচলিত হক আর পৃথিবীর মায়া মোহগ্রস্ত আর্ত্তের মুক্তিকল্পে 'চক্রনারায়ণ' রূপে তুমি স্বয়ং এখানে বিরাজিত থাক।"

নারায়ণ হেসে বললেন, "লক্ষ্মী, তোমার মনবাসনা পূর্ণ হক।"

আজও পুরুষোত্তমে এই "চক্রতীর্থে" লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী দানপুণ্য সঙ্কল্প আদি সম্পন্ন করে ধন্য হয়। পুরীধামে পঞ্চতীর্থের মধ্যে "চক্রতীর্থ" চতুর্থতীর্থ।

লীলাময় শ্রীজগন্নাথের মহান লীলার মহিমা ক্ষেত্র হল পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। তিনি কত লীলাই না করেছেন এই মহাতীর্থে। তাঁর প্রতিটি লীলার মধ্যে আছে লৌকিকজগতে লোক শিক্ষা। লোক হিতার্থে যুগে যুগে তিনি অবতরণ করেন। সার্থক হয় গীতার মহান বাণী "সম্ভাবাম্যাত্ম মায়য়া"।

তিনি আপন মায়ায় আবির্ভূত হন। লীলার মাধ্যমে সকলজীবকে বন্ধন করেন প্রেমের বাঁধনে। পবিত্র করেন তাঁর অমৃতময় স্পর্শে। মদমুক্ত করেন ভক্তির উৎসে অবগাহন করিয়ে কিন্তু জাগতিক মায়া মোহের আকর্ষণে মানুষ ভুলে যায় তাঁর অস্তিত্ব। তাঁরই কৃপাদত্ত ঐশ্বর্য্যের মোহে পার্থিব অহঙ্কারে বশীভূত হয়ে ক্ষণিক দৈহিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

লৌকিক জগতে সবইত' মিথ্যা, ক্ষণিক। একমাত্র সেই পরম পুরুষকারের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আর সেই আত্মসমর্পনের আকার ইঙ্গিত তাঁর লীলা মাহাত্ম্যের মধ্যেই নিহিত আছে। শ্রীজগন্নাথ পদে নিঃশেষে নিজেকে সমর্পনের পথে ভক্তিই হল একমাত্র সোপান। এক নীচকুলোদ্ভব নিষাদ রমনীর শ্রীপদে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনের অনবদ্য কাহিনীর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেছে শ্রীভগবানের এক অপূর্ব লীলা মাহাত্ম্য।

নিষাদ পত্নী গৌরী। বাস করে সহরের উপকণ্ঠে এক নিষাদ পল্লীতে। স্বামী বনে বনে শিকার করে গঞ্জের বাজারে মাংস বিক্রী করে। ছোট সংসার। কোন রকমে তাদের দিন চলে যায়। গৌরীর লক্ষ্মীর চরণে অচলা ভক্তি। কিন্তু, যেহেতু সে নিষাদ পত্নী, সেজন্য তার কোন পূজার অধিকার নেই। তা'তে তার কোন দুঃখ নেই। সে নিজনে নিভৃতে আপন মনে নীরবে লক্ষ্মীর পূজা করে। স্বামী দেখে হাসে। বলে, "তুমি একি করছ লক্ষ্মী? আমরা নীচ জাতি আমাদেরত' কোন দেব দেবীর পূজা করতে নেই। লোকে জানতে পারলে নানারকম দোষারোপ করবে।

লক্ষ্মী স্বামীর কথা মানে না। বলে, "কেন? মা লক্ষ্মী ত [illegible] এখানে যে [illegible] নিভৃতে তাঁর পূজা করি। তাতে লোকের বলার কি আছে? আমি সামাজিক ভাবেত' পূজা করছি না?" স্বামী চুপ করে থাকে। কথা বাড়ায় না।

এইভাবে প্রতিদিন স্বামী শিকারে বেড়িয়ে গেলে সে আপনমনে লক্ষ্মীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে। কোন মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারে না। মায়ের চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বলে, "মা, সত্যই কি তুমি আমার পূজা গ্রহণ করনা? আমি নিষাদ

কুলে জন্মেছি বলে কি তোমার পূজা করার, তোমাকে ভক্তি করার অধিকার হারিয়েছি? কোন উত্তর পায় না। কিন্তু প্রত্যহ মায়ের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করতে ভোলে না।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর কেটে যায়। গৌরী নিয়মিত লক্ষ্মীর পূজা করে চলে। অন্তরে কাঁদে, "মা, তুমিও কি এই দুঃখিনীর প্রতি নির্দয়? সবই কি আমার বৃথা?" গৌরী ভাবে শাস্ত্রের বাঁধন বড় না ভক্তির বাঁধন বড়?

একদিন হটাৎ এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায় গৌরীর বাড়ী। স্বামী শিকারে বেড়িয়ে গেছে। গৌরী লক্ষ্মীর পূজা করছে। এমন সময় এক অপরূপ রূপ লাবণ্যবতী বহু বর্ণের সুচীশিল্প খচিত পট্টবস্ত্র পরিহিতা ও মূল্যবান রত্নালঙ্কারে সজ্জিতা বধূ গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করে গৌরীকে আহ্বান করল। গৌরী তাড়াতাড়ি ঘর হতে বাইরে বেড়িয়ে এসে ঐ অপরূপা নারীকে দেখে বিস্মিত হল। মনে করল কোন ধনী গৃহস্থ বধূ কোন কারণে তাদের বাড়ীতে এসেছে। প্রথমে একটু লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বধূটি, হাসিমুখে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কি ভাই, আমাকে দেখে অমনভাবে দাঁড়িয়ে পরলে কেন? আমাকে বসতে বললে নাত'?" গৌরী আবার লজ্জিত হল। সে কি করবে ভেবে পেল না। সেত' ভাবতেই পারেনা যে সমাজের কোন উচ্চস্তরের গৃহস্থ বধূ তার গৃহে এমন অনাহুতের মত প্রবেশ করতে পারে। মনে করে কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। মুখে বলে, "আসুন, আসুন দিদি, আমার কি সৌভাগ্য যে আপনার মত সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ আমার মত দুঃখিনীর ঘরে পদধূলি দিয়েছে।"

বধূটি হেসে বলে, কে বললে তুমি দুঃখিনী? কই, তোমার মুখেত কোন দুঃখের ছায়া দেখছিনা? গৌরী মনে

মনে বিশেষ লজ্জিত হয়ে ভাবে "ছি! ছি! একি করছে সে? এখন পর্য্যন্ত বধুটিকে বসতে বলেনি?" সে তাড়াতাড়ি আপন আঁচল দিয়ে অঙ্গন মুছে একটা তালপাতার আসন পেতে দিয়ে বলে, "বসুন দিদি, আমার মত গরীবের ঘরে আপনাকে বসতে দেবার মত আসন নেই। কিছু মনে করবেন না।"

বধুটি বসলেপর গৌরী তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। "আপনাকে চিনতে পারলাম না'ত?" বধুটি হেসে বলল, "আমার বাড়ী শহরে। আমি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার গৃহদ্বার অতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেখে ভাবলাম এখানে বিশ্রাম করে যাই।"

গৌরী লক্ষীর প্রসাদী ফলমূল এনে বধুটির সামনে রেখে বলল, "আমার বাড়ী আপনি কিছু খাবেন না জানি, কিন্তু ফলে দোষ নেই।"

বধুটি বলল, "ফল কেন? তোমার হাতের রান্না খেতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কই কি রান্না করেছ? আমাকে দাও দেখি?" বলে হেসে উঠ্‌ল।

গৌরী মনে করে বধুটি রহস্য করছে। সে আরও লজ্জিত হয়ে বলে, "আমার রান্না আপনাকে দেব কি করে? আমরা যে জাতে নিষাদ।"

বধুটি বলল, "তা হক আমি খাব।" গৌরী নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সাহস হয় না তার রান্না ভাত তরকারী ঐ বধুটিকে দিতে। বধুটি আবার বলে, "দাও, কি রেঁধেছ, খেয়ে দেখি আমি কোন জাত মানিনা। সত্যি ভাই আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

গৌরী চম্‌কে ওঠে, ক্ষুধার্ত্ত! আর সে অপেক্ষা করে না। ভাত, ডাল, তরকারি যা' সে রান্না করেছে সব পরিপাটি করে সাজিয়ে এনে বধুটির সামনে রাখে। বধুটি আনন্দের সঙ্গে

সব খায়! কিছুক্ষণ পর দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'আজ তাহলে চলি ভাই, আবার আসবো।

গৌরী জানতেও পারল না, কে তার বাড়ী এসেছিল। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এসেছিলেন তার অন্তরের অনাবিল ভক্তির আকর্ষণে গৌরীর প্রতিদিনের ভক্তি অর্ঘ্য ব্যর্থ হয় নি।

এদিকে বলরাম লক্ষ্মীর প্রতি রুষ্ট হলেন। লক্ষ্মী নিষাদ গৃহে অন্নগ্রহণ করেছেন সুতরাং পরিত্যাজ্যা। তিনি জগন্নাথকে জানালেন লক্ষ্মী মর্ত্যের অস্পৃশ্যের ঘরে জলগ্রহণ করায় মন্দিরে তাঁর স্থান নেই।

জগন্নাথ অগ্রজের কথা অবহেলা করতে পারেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকে মন্দির হতে বার করে দিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিত অন্তরে চলে গেলেন সমুদ্রতীরে। সেখানে তিনি বাস করতে লাগলেন।

সেদিন বলরাম জগন্নাথকে রান্নার ব্যবস্থা করতে বললেন। জগন্নাথ মহা বিপদে পড়লেন। একদিকে তিনি অগ্রজের কথা অবহেলা করতে পারেন না, অপরদিকে তিনি রান্নার কিছুই জানেন না, কি করেন? অনেক কষ্টে কাঠ যোগাড় করে তিনি উনুন জ্বালাতে গেলেন। কিন্তু তাঁর শত চেষ্টাতেও উনুন জ্বালান গেল না। তিনি অগ্রজকে জানালেন: বলরাম তখন নিজে উনুন জ্বালাতে এলেন। কিন্তু সেই একই ব্যাপার। তিনি যতই চেষ্টা করেন উনুন জ্বালাতে কিছুতেই উনুন জ্বলে না। দুভাইয়ের প্রাণান্ত চেষ্টাতেও উনুন জ্বালান গেল না। তখন বলরামও জগন্নাথ পথে বেড়িয়ে পড়লেন ভিক্ষায়। সমস্ত সহর পরিক্রমা করেও মুখে দেবার মত কোন কিছু দুভাইয়ের ভাগ্যে জুটল না।

প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে পরিশ্রান্ত হয়ে তাঁরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলেন। সামনে দেখতে পেলেন এক বৃহৎ অট্টালিকা।

দুভাইয়ে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে সেই অট্টালিকার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। গৃহের পরিচারিকারা দেখল দ্বারে দুই ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তারা জিজ্ঞাসা করল, "ঠাকুর কি চাই তোমাদের ?"

ব্রাহ্মণেরা বললেন, "আমাদের এখনও আহার হয় নি। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত। আমাদের আহারের ব্যবস্থা কর।"

পরিচারিকা সবিনয়ে জানাল, "এ বাড়ীর কর্ত্রী চণ্ডালিনী। আপনারা কি এ বাড়ীতে অন্নগ্রহণ করবেন ?"

অন্তর্য্যামী নারায়ণ মৃদু হেসে অগ্রজের মুখের দিকে তাকালেন. তিনি সর্বজ্ঞ। সবইত' তিনি জানতে পারছেন। এত' তাঁরই এক মহান লীলা।

বলরাম পরিচারিকাকে বললেন, "দেখ এখন আমরা ক্ষুধার্ত্ত। জঠর অগ্নিতে সবই শুদ্ধ হয়ে যায়। জঠর জ্বালা কোন জাত বিচার করে না"

জগন্নাথ মনে মনে হাসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দুভাই স্নান করে খেতে বসেন। খেতে খেতে বলরাম বলে ওঠেন, "জগন্নাথ।, এ রান্না স্বয়ং লক্ষ্মীর রান্নার মত মনে হচ্ছে। তাঁরই হাতের পদ্মগন্ধ সব অন্নব্যাঞ্জনের মধ্যে জগন্নাথ নীরব। অগ্রজের কথার কোন উত্তর দিতে পারেন না। তিনি ত' সবই বুঝতে পারছেন। এ সবইত' তাঁরই লীলা।

বলরাম সন্দিগ্ধ চিত্তে আবার প্রশ্ন করেন, জগন্নাথ, তোর কি মনে হয় ? এরান্না স্বয়ং লক্ষ্মীর হাতের রান্নার মত নয় ?"

জগন্নাথ মাথা নিচু করে খেয়ে চলেছেন। অগ্রজের কথার জবাব এড়িয়ে যান। অগ্রজের প্রশ্নে তিনি কি করে মিথ্যা বলবেন ? তিনি একটু উল্টে, জবাব দিলেন। বললেন "সবইত' জান দাদা। আমি আর কি বলব ?"

বলরাম খাওয়া শেষ করে পালঙ্কের উপর উপবেশন

করলেন। পরিচারক পান নিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। বলরাম তার হাত হতে পান নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা তুমি বলত, তোমাদের কর্ত্রী কি নিজের হাতে এসব রান্না করেছেন ?''

পরিচারিকা বলে, হ্যাঁ প্রভু তিনি প্রতিদিনই নিজের হাতে রান্না করেন। তবে কোনঅতিথি অভ্যাগত এলে দুএক রকম বিশেষ ব্যাঞ্জনাদি রান্না করেন। আজ আপনাদের জন্ম সেই রকম কয়েকটি বিশেষ অন্ন ব্যাঞ্জন রান্না করেছেন।

বলরামের সন্দেহ বেড়ে যায়। তিনি যে ঘৃতান্ন ও পরমান্ন খেতে ভালবাসেন তা এবাড়ীর কর্ত্রী কি করে জানলেন। তিনি জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করেন, "জগন্নাথ, তোর কি মনে হয় ? আমার যেন মনে হচ্ছে এখানেই লক্ষ্মী অবস্থান করছেন " জগন্নাথ অগ্রজের দিকে ক্ষণেক তাকিয়ে মাথা নিচু করে উত্তর দেন, "তোমার কথার ওপর আমার কি বলার আছে। তুমি যা' সত্য বলে মনে করবে তা চির সত্য হয়ে প্রকটিত হবে।"

বলরাম বললেন, "না, না, জগন্নাথ তুই কপটতা করে আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছিস।" জগন্নাথ বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, "না, দাদা, তা' কখন হতে পারে ? আমি করব তোমার সঙ্গে কপটতা ?

তখন বলরাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে সত্য বল, আমার ধারণা কি মিথ্যা ?".

জগন্নাথ বললেন, "তোমার ধারণা কি মিথ্যা হতে পারে ?"

বলরাম অমন জোরের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই লক্ষ্মী এ বাড়ীর কর্ত্রী। আর তিনিই আমাদের জন্ম রান্না করেছেন "

জগন্নাথ নীরব। কোন কথা বলেন না। বলরাম পরিচারিকাকে ডেকে বললেন, "তোমাদের কর্ত্রীকে একবার

এখানে আসতে বলত।”

এবার জগন্নাথ জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, দাদা, তুমি কি পাগল হলে? আচ্ছা এ বাড়ীর কর্ত্রী কি আমাদের মত অপরিচিত ব্যক্তির সামনে আসতে পারেন?” বলরাম রেগে উঠে বললেন, “কেন? আমরা অতিথি, তার ওপর ব্রাহ্মণ, কর্ত্রীর এখানে আসতে বাধা কোথায়?” জগন্নাথ নীরব।

ইতি মধ্যে পরিচারিকা অন্দরে চলে যায়।

লক্ষ্মী কিন্তু অন্তরাল হতে সবই লক্ষ্য করছেন। দু একবার জগন্নাথকে কিছু ইঙ্গিতও করেছেন। পরিচারিকা অন্দরে প্রবেশ করলে পর’ লক্ষ্মী স্বয়ং বেড়িয়ে এলেন তিনি বলরাম ও জগন্নাথকে প্রণাম করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বলরাম লক্ষ্মীকে দেখে বললেন, মা আমার অন্যায় আচরণে কিছু মনে কর না। ঘরে ফিরে চল।”

জগন্নাথের দিকে ফিরে বললেন, অপরাহ্ণ হয়ে এল। আমি যাচ্ছি। তুই মাকে নিয়ে আয়।” বলরাম বেড়িয়ে গেলেন। লক্ষ্মী জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করেন, “এ আবার তোমার কি লীলা প্রভু?”

জগন্নাথ বললেন, জাতির মধ্যে উচ্চ নীচ বলে কোন ভেদাভেদ-নেই। মানুষ তার আপন গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণগত হয়।

“চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশ।”

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করেন, “তবে জগতে নীচকুলে জন্মেছে বলে আমার পূজার অধিকার হতে বঞ্চিত হয় কেন?”

জগন্নাথ বললেন, “এ তাদের ভ্রম নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দুর্বলের ওপর সামাজিক অত্যাচার।”

লক্ষ্মী পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, “তবে আমি ঐ নিষাদ

পত্নী গৌরীর পূজা গ্রহণ করে কোন অন্যায় করিনি?"

জগন্নাথ বললেন, "না, তুমি ঠিকই করেছ নিষাদ পত্নী গৌরী নিঃশেষে তার হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য তোমায় নিবেদন করেছে। আর তুমি তা' অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছ। তুমিও' ঠিকই করেছ লক্ষ্মী।"

তাহলে গৌরীর লক্ষ্মীপূজা ব্যর্থ হয় নি? না, তার অন্তরে যে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছিল তারই পবিত্র মুক্তধারার খর স্রোতে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল লৌকিক সমাজের এই জাতিগত মিথ্যা ভেদাভেদ ভাসিয়ে নিয়ে গেল মানুষে মানুষে মহা মিলনের পুণ্যতীর্থে। সার্থক হল মহাজন বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের প্রতিটি ধূলি কণা শ্রীজগন্নাথের লীলা মাহাত্ম্য বিজড়িত। তাঁর লীলার অন্ত নেই। সংসারের দুর্বি-সহ জ্বালায় ক্লিষ্ট মানুষ যখন মুক্তির কামনা নিয়ে তীর্থে পথে পাড়ি দেয় তখন সে অন্তরে শ্রীভগবানের নিকট একটিই মাত্র প্রার্থনা জানায় "হে ভগবান, আমাকে উদ্ধার কর প্রভু। তোমার অযাচিত করুণার অমিয় ধারায় পবিত্র কর, নির্মল কর আমার সব পার্থিব গ্লানি।"

ত্রিতাপ জড়িত এই আর্তের করুণ প্রার্থনা নারায়ণের কোমল হৃদয় স্পর্শ করে। তখন শ্রীভগবান তাঁর লীলা মাহাত্ম্যের প্রভাব বিস্তার করে আর্ত মানবকে মুক্তি পথের নির্দেশ দেন।

কলিতে পুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথ তাঁর অপার মহিমায় অলৌকিক মাধুর্য্যে আকর্ষণ করেন কোটি কোটি আর্ত ও ভক্তকে।

এইরকম এক মহানলীলার মাধুর্য্য ফুটে ওঠে রথযাত্রার প্রারম্ভে।

পুরুষোত্তমে রথযাত্রা। লক্ষ্মী "চাহনি বেদীতে" বসে নিখুঁত ভাবে সব লক্ষ্য করছেন। জগন্নাথ রথে আরোহণ

করে শুভ যাত্রা করলেন। তাঁকে সঙ্গে না নেওয়ায় দেবী ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি সেবকদের আদেশ দিলেন মন্দিরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দিতে। এতেও তাঁর ক্রোধ নিবারিত হল না। তিনি গভীর নিশীথে এলেন শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে। মহাক্রোধে রথ ভেঙ্গে গুড়ো করে দিয়ে মন্দিরে ফিরে এলেন। অন্তর্যামী ভগবান লক্ষ্মীর এই ক্রোধ দেখে অন্তরে হাসলেন।

শ্রীজগন্নাথের সেবক গজপতি মহারাজ শুনতে পেলেন যে গতরাত্রে কে জগন্নাথের রথ ভেঙ্গে দিয়েছে মহারাজ মহাচিন্তায় পড়লেন। তিনি নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। "প্রভু, একি লীলা তোমার? আদেশ দাও প্রভু আমি রথ পুনর্নির্মাণ করি।"

ভগবান রাজাকে স্বপ্নে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলে রথ পুনর্নির্মাণ করার অনুমতি দিলেন। রাজা পুনরায় রথ নির্মাণ করলেন।

আটদিন পর জগন্নাথ পুর্ণযাত্রা করে মন্দিরে ফিরে এলেন। বলভদ্র, সুভদ্রা যথারীতি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। জগন্নাথ পথে পরে রইলেন। তিনি বুঝতে পারলেন লক্ষ্মী ক্রোধবশে মন্দির দ্বার বন্ধ করে দিয়েছেন।

লক্ষ্মী 'চাহনি বেদীতে' বসে ক্রোধদীপ্ত নয়নে জগন্নাথের প্রত্যাবর্ত্তন লীলা অবলোকন করছেন। জগন্নাথ বহু অনুনয় বিনয় করে মন্দির দ্বার খুলে দিতে বললেন। কিন্তু কোন ফল হলনা। হায়, যিনি জগতের সকল প্রাণীর আশ্রয়। তিনি আজ নিরাশ্রয় হয়ে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে। ভগবান এও তোমার এক অভিনব লীলা। যখন জগন্নাথের সকল রকম মিনতি ব্যর্থ হয়ে গেল তখন লক্ষ্মী নারায়ণে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। সমস্ত দেবীরা নিলেন লক্ষ্মীর পক্ষ আর দেবতারা নিলেন জগন্নাথের পক্ষ।

সারারাত্রি চল্‌ল উভয় পক্ষের মহা দ্বন্দ্ব। শ্রীজগন্নাথের পক্ষে দেবতারা লক্ষ্মীর চরণে জানাতে লাগলেন সকাতর মিনতি। "হে দেবী, দ্বার খোলার অনুমতি দাও।" কিন্তু লক্ষ্মী অচল অটল।

কমলা পক্ষ সমস্ত দেবীরা লক্ষ্মীকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্য ও তাঁর পরিবর্তে ভগ্নী সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে গুণ্ডিচা যাত্রা করার জন্য জগন্নাথকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ফলে জগন্নাথকে কেন্দ্র করে দেবদেবীদের দ্বন্দ্ব লৌকিক কলহের রূপ ধারণ করল। উভয় দলের মধ্যে প্রবল বাক বিতণ্ডার মাঝে অনেক অশ্লীল গালি গালাজ চলতে লাগল। দুপক্ষের মধ্যে কোন পক্ষই হটবার পাত্র নয়।

রসরাজ শ্রীজগন্নাথ আপন লীলা রসে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছেন। তিনি আজ দর্শক। লক্ষ লক্ষ নরনারী ও ভক্ত নারায়ণের এই অপূর্ব লীলার রস মাধুর্য্যের অমিয় সুধাপান করছে।

অবশেষে লক্ষ্মীনারায়ণ উভয়ের সেবক গজপতি মহারাজের স্তুতি ও কাতর প্রার্থনায় লক্ষ্মীর হৃদয় বিগলিত হল। তিনি মন্দির দ্বার খুলে দিতে আদেশ দিলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

লক্ষ্মী নারায়ণের এই অপূর্ব ও অপরূপ লীলার মধ্যে ফুটে ওঠে স্বর্গীয় প্রেম ও ভক্তি রসের মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র।

সংসারে পার্থিব মোহের বশবর্ত্তী মানুষ আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয়ে ডেকে আনে আপন অমঙ্গল। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে ভুলে যায় মানবিক সত্বা। জাগ্রত হয় প্রবল পাশবিক শক্তি, যা' তাকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে।

স্ত্রী ও পুরুষের আনন্দ ও অশ্রুতে গড়া এই অল্পস্থায়ী সংসার অশান্তির মহাচক্রে আবর্ত্তিত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়

মহাকালস্রোতে। বিলুপ্ত হয়ে যায় সেই পুরুষাকারের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের অন্তরের কোমল বৃত্তি। সমগ্র জগত তখন হয়ে পরে দুস্কৃতের দুরাচারের যুপকাষ্ঠের বলি। অনন্ত আকাশ ভেদ করে সোচ্চার হয়ে ওঠে বসুধার আর্ত্ত হাহাকার। আছড়ে পড়ে সেই পরম পুরুষাকারের অভয়পদে কোটি কোটি নিপীড়িত, নিষ্পেষিত মানব কণ্ঠের আকুল আর্ত্তনাদ, "ত্রাহি মাং পুণ্ডরী-কাক্ষ সর্বপাপ হরহরি।"

ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর মহান লীলার মধ্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দেন যা'তে তারা দ্বন্দ্বের পথ পরিহার করে, প্রেমের পথ অবলম্বন করে ও ভগবৎ ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবিক কল্যাণ কর্মে ব্রতী হয়। সার্থক হয় তাদের মানব জন্ম।

সৎ সুকৃতের ধ্যান করে যেইজন।
সৎ ও সুকৃত জান সেই মহাজন॥
তার সম পুণ্যআত্মা নাহি এ ধরায়।
মুক্তিলাভ হয় তার বাস অমরায়॥
সত্যহীন দীন দুঃখী পাতকী সংসারে।
নর দেহ ধরি ভোগে নরক আগারে॥
"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥

(ষোল)

কলিতে পরমপুরুষাকার সেই সর্ব শক্তিমাণ, সর্ব নিয়ন্তা শ্রীজগন্নাথের আর্বির্ভাব এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে। সেইজন্য জগন্নাথ ও জগন্নাথ ক্ষেত্র জগতে সকলেরই সুপরিচিত। এখানকার ধর্ম ও দর্শন অত্যন্ত ব্যাপক ও অসঙ্কুচিত। শৈব, সৌর, গাণপত্য, কৌল, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মত এর অন্তস্থ। কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে মত বিরোধ এখানে নেই। শ্রীজগন্নাথ নির্গুণ, নিরাকার, নিরঞ্জন ও দারুব্রহ্ম সনাতন। তিনি দারুমূর্ত্তিতে সগুণ ভাবে স্বানুগ্রহে প্রকটিত। এই হল পুরুষোত্তক্ষেত্রের বৈশিষ্ট' শ্রীজগন্নাথের মত শ্রীমন্দির ও বিরাট বিশ্ব বিগ্রহের প্রতিবিম্ব। এই অব্যক্ত স্বয়ম্ভু শ্রীজগন্নাথ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই রূপায়িত হয়েছিলেন। পুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, নারদ, পদ্ম ও স্কন্দ পুরাণে সবিস্তারে জগন্নাথ মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্র, আগম এমনকি বেদেও এর প্রকট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কবে এই পুরুষোত্তক্ষেত্র বৈষ্ণব ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তা' ঠিক করে বলা যায় না।

পূজা আরাধনায় সমন্বয় রাখার জন্য শিব ও দুর্গাকে বিষ্ণুর সঙ্গে পূজা করা হলেও বিষ্ণুরূপী জগন্নাথের প্রাধান্য ও বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। এই সময়ই মনে হয় চতুর্মূর্ত্তির কল্পনা করা হয়। সেইজন্য একই পীঠে বলভদ্র, সুভদ্রা, জগন্নাথ ও সুদর্শন এক সঙ্গে পূজিত হয়। যদিও কৃষ্ণ উপসনার প্রভাবে বলভদ্রকে বলরাম বা 'বড়ভাই', সুভদ্রাকে ভগিনী ও সুদর্শনকে আয়ুধরূপে পূজা হয়ে আসছে। কিন্তু শৈবেরা বলভদ্রকে শিবরূপে, শাক্তরা সুভদ্রাকে শক্তিরূপে ও বৈষ্ণবেরা জগন্নাথকে কৃষ্ণরূপে আরাধনা করে আসছেন।

এই পীঠ মহাপীঠরূপে জগতে সর্বধর্মের লীলাভূমিতে

পরিণত হয়েছে। রূপরিত হয়েছেন বিমলা ভৈরবী রূপে ও জগন্নাথ ভৈরবরূপে।

"বিমলা ভৈরবী যত্র জগন্নাস্তু ভৈরব।"

প্রাচীন আগম পুরাণে ও বেদে দারু বিগ্রহের উল্লেখ আছে। বৈদিক প্রমাণ হিসাবে জগন্নাথের প্রাচীনতা সম্পর্কে ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৫৫ সূত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

"অদো যদ্দারু প্লবতে সিন্ধু পারে অপুরুষম্।
তদা রভস্ব দুইনো তেন গচ্ছ পরস্তরম্॥"

হে অলক্ষী, সিন্ধু তীরে সে অপুরুষের দারু ভাসছে সেই দারুকে আশ্রয় করে তুমি অপর পারে চলে যাও। বেদের অন্যতম ভাষ্যকার শ্রীমদ্ সায়নাচার্য্য এই যুক্তিকে 'পুরুষোত্তম' অর্থে গ্রহণ করেছেন। এর মর্মার্থ হল "হে ভক্তগণ, সিন্ধুতীরে স্বয়ম্ভু পুরুষোত্তম দারু বিগ্রহ রূপে বিরাজিত। আপনারা তাঁকে আশ্রয় করে অর্থাৎ তাঁর উপাসনা করে দিব্যলোকে গমণ করুন" এই মন্ত্রটি অথর্ববেদেও উল্লিখিত আছে। রামায়ণ মহাভারতেও শ্রীজগন্নাথের উল্লেখ আছে। বাল্মিকী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে "আরাধয় জগন্নাথম্ ইক্ষাকু কুলদৈবতম্" বা মহাভারতের শান্তি পর্বে "এষোধর্ম জগন্নাথ সাক্ষাৎ নারায়ণ নৃপঃ" প্রভৃতি উক্তি লক্ষণীয়। রামায়ণে কিষ্কিন্ধা কাণ্ডে সীতা অন্বেষণের জন্য হনুমানকে সুগ্রীবের নির্দেশে দেখা যায় পুরুষোত্তম্, দেবিকা। সুদর্শন ও অনন্তদেবের নাম। বলাবাহুল্য একমাত্র নীলাচলেই এইসব দেবতার পূজা হয়। এর সঙ্গে চতুর্মূর্ত্তিদারু বিগ্রহের সংযোগ থাকতে পারে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র চারটি মণ্ডলে বিভক্ত। নীলাচলে সিন্ধু তীরবর্ত্তী স্থান শঙ্খ মণ্ডল। মহানদী শাখা কুশভদ্রা নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান চক্র মণ্ডল। বৈতরিনী নদীর নিকটবর্ত্তী

যাজপুর গদা মণ্ডল ও চন্দ্রভাগা নদীর নিকটবর্ত্তী কোনার্ক পদ্মমণ্ডল।

সমগ্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আবার পঞ্চদেবতার নাম অনুসারে পাঁচটি ক্ষেত্রে বিভক্ত। নীলাচল নারায়ণ ক্ষেত্র, ভুবনেশ্বর শিব-ক্ষেত্র। যাজপুর শক্তিক্ষেত্র, কোণার্ক সূর্য্যক্ষেত্র ও মহাবিনায়ক গণেশ ক্ষেত্র।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সারা ভারতের বহু মনীষী, যোগী, সাধক, ভক্ত ও দার্শনিক এসে তাঁদের ধর্ম মতকে উদ্জীবিত ও রসান্বিত করেছেন। জগন্নাথ ধর্ম এক সমন্বয়াত্মক ধর্ম। সকল ধর্মের সার সনাতন হিন্দু ধর্মকে বিজয় বৈজয়ন্তী মালা পরিয়েছে। জগন্নাথ ধর্ম বলতে পুরুষোত্তমে প্রতিষ্ঠিত ধর্মকেই বোঝায়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সবধর্ম ও সব উপসনার এক সমন্বয় সাধন করেছে।

জগন্নাথের পূজা ও প্রচলিত নীতি পদ্ধতিতে অভেদ, ভেদ, ভেদাভেদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদাদি দর্শন সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। মহাপ্রসাদ অন্নে অভেদভাব, নৈবেদ্য সামগ্রীতে নিবেদনের পূর্বে ভেদভাব ও পূজার জল আনার মধ্যে ভেদাভেদভাব সমন্বিত হয়েছে।

শ্রীজগন্নাথ বিভিন্ন পর্বে পঞ্চদেবতার রূপধারণ করে সব ধর্ম ও সব উপাসনার প্রতীকরূপে প্রকটিত হন। রত্নবেদীতে তিনি নারায়ণ, স্নানবেদীতে তিনি গণেশ নবকলেবরে তিনি রুদ্র ও রথযাত্রায় তিনি সূর্য্য।

ভারতের আর কোথাও কোন দেবতা বিভিন্ন রূপ ধরে সবধর্ম ও সব উপসনার পরিচয় দেননা। শ্রীজগন্নাথের নানারূপ ধরে নানা সম্প্রদায়ের ভক্তগণের ভোগ পূজা গ্রহণ করা পুরুষোত্ত ক্ষেত্রের একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট।

শ্রীজগন্নাথ তত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত বিশিষ্ট প্রথা হল কলেবর

পরিবর্ত্তন। এর মূলে আছে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ তার নিজের দৃষ্টিতে দেবতাদের বিচার করে। অব্যক্ত আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহে প্রবেশ করে। এ ধারণা ভারতীয় সংস্কৃতিতে নূতন নয়।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি॥
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি।
সংযাতি নবানি দেহী॥

আত্মার বিনাশ নেই কিন্তু দেহের বিনাশ আছে। "যথা দেহে তথা দেবে" এই দৃষ্টিতে কলেবর পরিবর্ত্তনের দার্শনিকতত্ব বিচার করতে হবে।

বিষ্ণু সংহিতায় উক্তি—

"দেহ দেহী যথা জীর্ণং তক্ত্বা দেহান্তরং ব্রজেৎ।
তক্ত্বা জীর্ণং তথা বিম্বং দেবোঽপি ভজতে নবম্॥"

সুতরাং জগন্নাথের কলেবর পরিবর্ত্তন প্রথার মধ্যে শাস্ত্রীয় সমর্থন আছে। মর্ত্তি পরিবর্ত্তন হলেও ব্রহ্মাস্থির পরিবর্ত্তন হয় না। শ্রীজগন্নাথের দারুমূর্ত্তির প্রশস্তি ভবিষ্যপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে ও সংহিতায় পরিস্কার ভাবে বর্ণিত আছে। বৃহৎ সংহিতায় আরও বলা হয়েছে দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলে চারটি ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যমূর্ত্তি উপাসনা করলে এত ফল পাওয়া যায় না। কাশ্যপ শিল্প বৈথানম্, আগম প্রভৃতিতে এই দারুমূর্ত্তি উপসনায় প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে

শ্রীজগন্নাথের নীলাচলে অবস্থানের কথা স্কন্দ পুরাণে একটি ক্ষুদ্র কাহিনীর মাধ্যমে সুন্দর ভাবে উল্লিখিত আছে। সৃষ্টির পর সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা জীবের মুক্তির উপায় চিন্তা করে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বললেন, "নীল গিরির

পাদদেশে সিন্ধুতটে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আমার দর্শন মাত্র জীব মুক্তি পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ কলেবরকে মাধ্যম করে যে সব কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যথা –

১) শ্রীকৃষ্ণের দেহাস্থি সহযোগে শ্রীজগন্নাথের দারুমূর্ত্তি নির্মাণ।

২) শবররাজ বিশ্ববসুর 'নীলমাধব' নামে কৃষ্ণদেহ পূজা।

৩) দারুমূর্ত্তি নির্মাণে বিশ্বকর্মার ভূমিকা।

৪) দারুমূর্ত্তি পরিকল্পনা।

এসবের প্রত্যেকটির অনুশীলন ও আলোচনা করলে জানতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীজগন্নাথ অচ্ছেদ্য

বেদে যে "অদোযদ্দারু প্লবতে" কথাটির উল্লেখ আছে তার দ্বারা একটি পরম্পরা সৃষ্টি করা হয়েছে আর এই বৈদিক পরম্পরা দৃষ্টি ও কল্পনাকে সামনে রেখে পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারগণ এই "পরম্পরাকে" রক্ষা করতে চেয়েছেন। শবর পল্লীর নীলমাধব রূপে শ্রীকৃষ্ণ কলেবর ও শ্রীজগন্নাথের সম্বন্ধ স্থাপনের মূলে আর্য্য ও অনার্য্য দেবতার সমন্বয় করা হয়েছে। আর্য ধারণায় ব্রহ্ম অপানিবাদ হলেও সাকার দেবদেবী কিন্তু তা' নন বিশ্বকর্মার দারুমূর্ত্তি নির্মাণ কাহিনীতে লক্ষ্য রেখে জগন্নাথ বিগ্রহের অপূর্ণতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্মাণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে। বৈদিক যুগে দারু বা বৃক্ষ উপাসনার সঙ্গে দারুব্রহ্মরূপী শ্রীজগন্নাথের উপাসনার সমন্বয় করা হয়েছে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীভগবান তিন ভাগে বা তিন স্তরে অবস্থিত। যদিও তিন স্তরই তাঁর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, তাহলেও পুরুষোত্তম স্তরে তাঁর 'সৎ' স্বরূপের অক্ষর পুরুষের স্তরে তাঁর 'চিৎ' স্বরূপের ও ক্ষর পুরুষের স্তরে তাঁর 'আনন্দ' স্বরূপের এক মহিমময় বৈশিষ্ট ফুটে উঠেছে।

একশোদশ

সেজন্য জগন্নাথরূপী ভগবান 'সৎ' স্বরূপ, বলরাম 'চিৎ স্বরূপ' ও সুভদ্রা 'আনন্দ' স্বরূপ। প্রকটভূমিতে আবার সৎরূপে জগন্নাথ ভগবানের প্রেমঘন মূর্ত্তি। 'চিৎ' রূপে বলরাম বিজ্ঞান ঘনমূর্ত্তি। 'আনন্দ' স্বরূপে সুভদ্রা ভগবানের শক্তি তথা আনন্দঘন মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের তিনস্তরের এই স্বরূপগত পরিচয়।

সৃষ্ট ও অসৃষ্টের মধ্যে যে সামঞ্জস্য সূত্র তা অতি সূক্ষ ও জটিল। চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে সেই জটিলতার অতিপার্থিব সূক্ষ মিলন রয়েছে অনন্তের দর্শনাক্ষম চেতনাকে জীবনের জাগ্রত চেতনাময় রূপে পরিণত না করতে পারলে সেই অপার্থিব সূক্ষ বিষয়কে ধরা সম্ভব নয় সুতরাং জগত কে মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সেই সূক্ষ তত্ত্বের অবধারনা এই ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে।

জগন্নাথ ধামের সব ব্যবস্থা যেমন অসাধারণ তেমনই প্রতিষ্ঠিত দেবতার মূর্ত্তি ও অসামান্য। যে কোন দিকহতে বিচার করলে এই সত্যই প্রকটিত হবে। এই মূর্ত্তি রূপ ও অরূপের মিলনাদর্শ। নিরাকার ও আকারের সমন্বয়। দার্শনিক, সাধক ও ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ জগন্নাথকে মন্ত্রময় আবার কেউ কেউ যন্ত্রময় মূর্ত্তি রূপে কল্পনা করেন। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে এই ত্রিমূর্ত্তিকে 'একেমেব অদ্বিতীয়ম্' সেই পরম পুরুষাকারের স্মারক মূর্ত্তি বলে মনে হবে।

জ্ঞানীগণ ত্রিমূর্ত্তিকে সত্ব, রজ তম ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এবং জাগৃতি স্বপন সুষুপ্তি বলেছেন। জগন্নাথ অব্যক্ত পুরুষ। তিনি নিজের ইচ্ছারূপীণি শক্তি সুভদ্রা ও বিরাট রূপী বলভদ্র ও সৃষ্টির কাল তত্ত্ব সুদর্শন রূপে রত্ন বেদীতে অবস্থিত। শ্রীজগন্নাথ সূক্ষ জগতের, বলভদ্র স্থূল জগতের অধীশ্বর ও

সুভদ্রা এই দুই জগতের মধ্যাস্থিতা। একমাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ছাড়া আরকোথাও এই সৃষ্টি তত্ত্বের আদর্শ দেখা যায় না।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথের মন্ত্রি রূপে পঞ্চশিব যথা যজ্ঞেশ্বর, লোকনাথ, কপাল মোচন, মার্কণ্ডেশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর বিরাজ করছেন। মহান সম্রাট রাজচক্রবর্ত্তী যেমন সিংহাসনে বসে রাজকীয় ঐশ্বর্য্য মর্য্যাদায় মন্ত্রি, সভাসদ, সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি রাজ্য শাসন করেন সেই রকম স্বয়ংভগবান নিজের অংশবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হয়ে ত্রিজগত শাসন করেন। শ্রীমদভাগবতে অবতার ও শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বলা হয়েছে "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

পঞ্চতীর্থ বেষ্টিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আপন মহিমায় মহিমময় হয়ে আহ্বান জানায় মুক্তিকামী কোটি কোটি আর্ত্ত ও ভক্তকে। অগণিত পুণ্যার্থী স্নান পুন্য দান সঙ্কল্প আদি সকল রকম পুণ্য কর্ম করেন এই মহাক্ষেত্রের মহাতীর্থে।

"মার্কণ্ডেয়া বটকৃষ্ণে রোহিনীয়ে চ মহোদধী।
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরে স্নাত্বা পুণর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র আবার শ্রীক্ষেত্রও বটে। সত্যই শ্রীক্ষেত্র এখানে কেউ উপবাসী থাকেনা। চারিদিকে মঠে মন্দিরে 'মহাপ্রসাদের' ছত্র। জগন্নাথের "মহাপ্রসাদ' নীলাচলের বিশেষত্ব। সবজায়গায় দেবতার প্রসাদ বিতরণ হয়। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বিতরণ হয় 'মহাপ্রসাদ'। লক্ষ্মীর নিজের হাতের রান্না ভোগ জগন্নাথকে নিবেদনের পর ভৈরবী বিমলাকে সমর্পণ করা হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে এই ভোগ 'মহাপ্রসাদে' পরিণত হয়। জগন্নাথের রত্নবেদী হল যোগপীঠ। এই যোগপীঠের দেবতাকে নিবেদিত হবার সময়ে অন্নব্রহ্ম, দারুব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম এই তিন ব্রহ্মের মিলনে এক অপূর্ব ভাবের উদয় হয়।

তখন যা কিছু নিবেদিত হয় সবই 'মহাপ্রসাদ'। সবার ওপর যখন এই ভোগের পাচিকা স্বয়ং মহালক্ষ্মী তখন এই ভোগ যে 'মহাপ্রসাদ' রূপে সর্বজীবে বিতরিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

"যদন্নং পাচয়তে লক্ষ্মীঃ
হরয়ে পরিবেশনং।
স্বয়ং জনার্দ্দন ভোক্তা
কঃ যংশয়তি পার্বতী॥"
পুনশ্চ জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং
মহাপাতক নাশানম্।
ভক্ষনাৎ ফলমাপ্নোতি
কপিলা কোটি দানজম্॥

শঙ্খের নাভী মণ্ডলে অবস্থিত নীলাচল। জগন্নাথ ক্ষেত্র ও শ্রীক্ষেত্র। এর উত্তরে সারদা, দক্ষিণে সিন্ধু, পূর্বে রামচণ্ডী ও পশ্চিমে হরচণ্ডী। এই সুরক্ষিত মহাক্ষেত্র হল লক্ষ্মী নারায়ণের লীলা ভূমি। তাঁদের শত শত লীলা বিজড়িত এই নীলাচল। এখানে কত মহাপুরুষ রেখে গেছেন তাঁদের নিজেদের দার্শনিক তত্ত্বের মত ও পথনির্দেশ। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, গোরখনাথ, গম্ভীরনাথ, কবীর, নানক, জয়দেব ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি যুগাবতারগণ। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সত্‌নামের কীর্ত্তন করে গেছেন সেই পরম পুরুষাকারের শ্রীপাদ-পদ্মে গতি পথের নির্দেশ হিসাবে। মুক্ত করে গেছেন কত পাপী তাপীকে। পার্থিব ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ মানুষ ছুটে এসেছে এই মহাক্ষেত্রে মুক্তি পথের সন্ধানে।

কলির মুক্তিদাতা, ভব সিন্ধুর মহান ত্রাতা, দারুব্রহ্ম সনাতন শ্রীজগন্নাথ আকর্ষণ করেন লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত ও ভক্তকে ত্রাণের মহামন্ত্রে—

একশোবার

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
ভবামিন চিরাৎপার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম।।"

হে জগন্নাথ, তোমার অপার করুণার স্নিগ্ধ মন্দাকিনী নীরে সিক্ত করে তোমারই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে এই প্রপঞ্চময় পার্থিব লালসাযুক্ত মোহ হতে মুক্ত করে তোমার ঐ রাতুল চরণে স্থান দাও প্রভু।

হে দীননাথ, পতিত পাবন এই হিংসাদ্বেষ জর্জরিত মানুষের কলঙ্ক কালিমাকে অমৃতধারায় ধুয়ে মুছে দিয়ে তোমার চরণামৃতে পবিত্র করে অমৃত লোকে নিয়ে চল প্রভু।

"কদাচিৎ কালিন্দী তট বিপিন সঙ্গীত করব
মুদাভীরি নারী বদন কমলা স্বাদ মধুপ।।
রমা শম্ভু ব্রহ্ম সুরপতি গণেশার্চিত পদ
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।"

—